মায়ের লীলা-কথা

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY

VARANASI

মায়ের লীলা-কথা

LIBRARY
2/104
No. 6/66
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

First Edition
April 1978

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

Published by Shree Shree Anandamayee Charitable Society, Varanasi and Printed at K. P. Basu Printing Works, 11, Mohendra Gossain Lane, Calcutta-6.

মায়ের লীলা-কথা

নরেন চৌধুরী
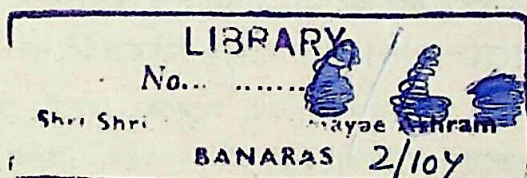
SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY
VARANASI

নিবেদন

মায়ের প্রথম দর্শনেই আমি এতই চমৎকৃত ও অভিভূত হ'য়েছিলাম যে মাতৃসঙ্গের দিনগুলির কোনও ধারাবাহিক ডায়েরী রাখার চিন্তাও আমার মনে হয়নি। তবুও এই পুস্তিকার প্রথম চার অধ্যায়ে মাতৃলীলার বিশদ বর্ণনা যেভাবে দেওয়া হয়েছে—সেটা সম্ভব হ'য়েছে কয়েকটি বিশেষ কারণে।

প্রথমতঃ, এইসব লীলা-কথা অনেকের কাছে—বিশেষতঃ বহু মাতৃভক্তের কাছে পুনঃপুনঃ বিবৃত ক'রে, ঐগুলি আমার স্মৃতিপটে গভীরভাবে রেখাপাত করায়, ঐসব কথা পুনরুদ্ধার করতে আমার কোনও কষ্ট হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, গুরুপ্রিয়া দিদির সযত্ন-রক্ষিত ডায়েরী থেকে লেখা "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" গ্রন্থের কয়েকটি ভাগে বর্ণিত বিবরণ থেকেও—বিশেষতঃ কতকগুলি ঘটনার সঠিক সন-তারিখ-নির্ণয়ে—আমি উল্লেখযোগ্য ও অপরিহার্য সাহায্য পেয়েছি। তৃতীয়তঃ, আমার দুই কন্যা—যারা কয়েকবার আমার সঙ্গে গিয়ে মায়ের কাছে থেকেছে—তাদের নিকটও অনেক ঘটনার সঠিক (অথবা আনুমানিক) সন-তারিখ সংগ্রহ ক'রেছি। সর্বোপরি, মায়ের অহেতুকী কৃপা আমার স্মৃতিশক্তিকে সর্বদা অকুণ্ঠ সহায়তা ক'রেছে।

এই পুস্তিকার প্রথম সাত অধ্যায় লেখা শেষ হয়—১৯৭৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে। অষ্টম অধ্যায় পুনর্লিখিত হয় ১৯৭৬ সালে। তার পরে, নানারকম বাধা-বিঘ্নের জন্য পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ ক'রতে দেওয়া হ'য়ে ওঠেনি। ১৯৭৮ সালের প্রারম্ভে পাণ্ডুলিপি প্রেসে পাঠানো হয়।

প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীত্রিদিবেশ বসু মহাশয়ের সৌজন্যে এপ্রিলেই মুদ্রণ শেষ হ'য়েছে। তাঁর বদান্যতার জন্য বর্তমান মহার্ঘতার দিনে পুস্তকের মূল্যও সীমিত রাখতে সক্ষম হয়েছি।

কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ
২৫ এপ্রিল ১৯৭৮

নরেন চৌধুরী

সূচীপত্র

—

শুদ্ধি-নির্দেশ

পৃষ্ঠা সংখ্যা	লাইন সংখ্যা	মুদ্রিত পাঠ	সংশোধিত পাঠ
৫৭	নীচে থেকে ৪র্থ	কৈলাস-	কৈলাস-যাত্রা-

এই ফটো তোলা হ'য়েছিল নিউ দিল্লীতে
৩১শে মার্চ ১৯৩৭ তারিখে।
বিবরণ ১৪ পৃষ্ঠায়।
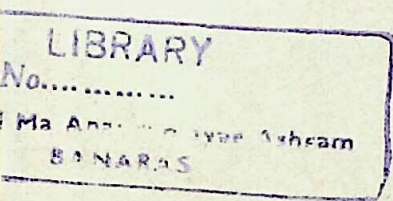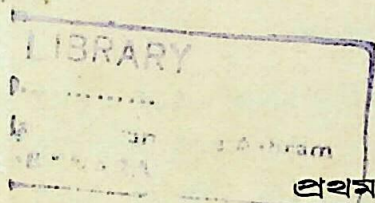
প্রথম অধ্যায়

নিউদিল্লীতে ছয় দিন

(২৬শে মার্চ — ৩১শে মার্চ, ১৯৩৭)

দোলপূর্ণিমা, ২৬ মার্চ, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ। আগের দিন সন্ধ্যায় সুসংবাদ পাওয়া গেল যে, মা আনন্দময়ী নিউদিল্লীতে এসেছেন, এবং ১৩ নম্বর ক্যান্টন্‌মেণ্ট রোডে, শ্রীপঞ্চানন মুখার্জির কোয়ার্টারের প্রাঙ্গণে তাঁবুতে অবস্থান করছেন। এর কয়েকদিন আগে, আমাদের হনুমান্ রোডের ফ্ল্যাটে একজন বর্ষীয়সী ভক্তিমতী মহিলার (*) সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল। আমি দুঃখ ক'রে বলছিলাম,—দিদি, অনেক জায়গায় ঘুরেছি, অনেক খ্যাতিমান্ সাধু ও মহাত্মা দেখেছি। কিন্তু, মনের মতো কোনও মহাত্মা—যাঁর চরণে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হব,—আজও চোখে পড়ে নি। তিনি বললেন,—চৌধুরী মশাই, আমরা সিমলাতে মা আনন্দময়ীকে দেখেছি। তাঁকে নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগবে। তিনি শিগ্‌গির নিউদিল্লীতে আসবেন। তিনি এলেই আপনাকে সংবাদ দেবো।

ঐ সংবাদ পেয়ে, পরের দিনই সকালে ৭-টা আন্দাজ

---

* শ্রীমতী যোগমায়া দেবী ; ইঁহার স্বামী ৺প্রিয়নাথ ব্যানার্জী ভারত-সরকারের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

আমরা (আমি ও আমার সহধর্ম্মিণী যূথিকা—এঁকে এরপরে 'ছবির-মা' ব'লে অভিহিত করবো) ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট রোড ধ'রে চল্‌লাম। পথে, শ্রীসুধীর গুপ্ত (ইনি ইতিপূর্বে মা-কে সিমলায় দেখেছেন এবং মায়ের প্রতি কিছুটা আকৃষ্টও হ'য়েছেন) আমাদের সঙ্গ নেন। তিনজনে সাড়ে সাতটার মধ্যেই মায়ের তাঁবুতে প্রবেশ ক'রলাম। সেখানে যা' দেখলাম, তার বর্ণনা ভাষার বাহনে সম্ভব নয়। দেখলাম, অপূর্ব মাধুর্য্য, অনুপম দ্যুতি এবং অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বিরাজ ক'রছে একটি মনুষ্য দেহ আশ্রয় ক'রে। ইনিই সেই আনন্দময়ী মা,— শ্বেতবসনা, নিরাভরণা, আলুলায়িত কুন্তলা। মায়ের দর্শনলাভে আমার জীবন সার্থক হ'ল। মা স্থিরভাবে উপবিষ্টা, প্রশান্ত-মূরতি। আমিও তাঁবুর এক কোণে ব'সে —প্রায় তিনঘণ্টা কাল অবশভাবে, অবাক্ হ'য়ে, মাতৃদর্শন ক'রেছিলাম। শুধু মাতৃদর্শন, নির্নিমেষ নয়নে শুধুই মাতৃদর্শন। মায়ের সম্মুখে চ'লছিল নাম-কীর্তন। তা'তে অংশগ্রহণ ক'রেছিলেন পূজ্যপাদ ভোলানাথ, যিনি লৌকিক দৃষ্টিতে মায়ের পতি। নামের ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'রে থাকবে, কিন্তু মরমে প্রবেশ করতে পারে নি। তখন আমার সমস্ত অন্তর ব্যাপ্ত ক'রে বিরাজ ক'রছিলেন মা—শুধু মা।

প্রায় ১১টা নাগাৎ তাঁবু থেকে বেরিয়ে, পঞ্চুবাবুর বাড়ীর পিছনের অঙ্গনে গিয়ে, মা সমাগতা মহিলা ও বালিকাগণের সঙ্গে মহা-আনন্দে হোলি খেললেন। নারী ও বালিকা-কণ্ঠের উচ্চ আনন্দ-কোলাহল আমরা সামনের দিক্ থেকেও শুনতে

পাচ্ছিলাম। প্রায় বারোটায় মা বাইরে এসে, পুরুষ ভক্ত, যাদের সামনে পেলেন—একে একে প্রত্যেকের গায়ে আবীর দিতে লাগ্‌লেন। আমার কাছে এসে, মধুরকণ্ঠে মা ব'ললেন, —বাবা, দিই ? এই অযাচিত করুণায় আমি অভিভূত হ'য়ে পড়লাম। আমার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না ক'রেই—মায়ের গায়ের চাদরটা আবীর-মাখা ছিল—তারই একটা প্রান্ত মা আমার একটা হাতে ঘ'ষে দিলেন। সেই সঙ্গে আমি মায়ের হাতের স্পর্শও পেলাম। অসংকোচে, প্রাণ ঢেলে চরণযুগলে মাথা রেখে প্রণাম ক'রে মনে মনে প্রার্থনা জানালাম,—মাগো, রঙ্ শুধু গায়ে দিচ্ছ কেন ? অন্তরেও দাও। পরে, অন্তরের দিকে চেয়ে বুঝেছি, আমার স্বতোৎসারিত প্রার্থনা মা তখনই মঞ্জুর করেছেন।

দুপুরে বাড়ী ফেরবার আগেই, সুধীর গুপ্ত আমাকে প্রশ্ন করেন,—আমি মা-কে কেমন দেখলাম। একটুও না ভেবেই, আমার উত্তর বেরিয়ে এল,—দেখলাম, একেবারে পরমহংসদেব। আমি মনে মনে দুঃখ ক'রে ঠাকুরকে জানাতাম, —ঠাকুর, তুমি এলে এবং চলে গেলে, কিন্তু হতভাগ্য আমি তোমাকে দেখতে পেলাম না। আমার সে দুঃখ আজ ঘুচেছে।

ঐ দিন থেকে যে ছয়দিন মা নিউদিল্লীতে ছিলেন, আমি কনট্‌প্লেসে আমার স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনে আদৌ যেতে পারি নি। মায়ের দুর্বার আকর্ষণে, দিনরাত্রির মধ্যে যত-বেশী-সম্ভব সময় মাতৃসন্নিধানে কাটাতে বাধ্য হয়েছিলাম।

সাধারণতঃ, সুস্থদেহে আমি রবিবারে এবং অন্য ছুটির দিনেও, নিজের বিদ্যায়তনে কয়েকঘণ্টার জন্য না গিয়ে পারতাম না,—এমনই ছিল আমার কাজের নেশা। কিন্তু এ কয়দিন মাতৃসঙ্গরসাস্বাদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার চিরাভ্যস্ত বৈষয়িক কর্তব্যপরায়ণতাকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত ক'রেছিল।

মায়ের এই তীব্র অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের শিকারও দেখলাম—অগণিত। তার মধ্যে ছিলেন অনেক সিমলা-দিল্লীর হোম্‌রা-চোম্‌রা ও বড়-মাঝারি-ছোট বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারী,—হারাণবাবু (রায়বাহাদুর), সুধীর সরকার, দুর্গাদাসবাবু, চারুবাবু, জিতেন দত্ত, পঙ্কজ সেন,—উত্তর-প্রদেশের লোক, কাশ্মীরি পণ্ডিত, এবং তাঁদের মাতা, জায়া ও পুত্রকন্যাগণ। আমার বড় কন্যা ছবি—তখন তার বয়স ১৪ বৎসর—এবং তার মা-ও এই দুর্জয় অপ্রাকৃত আকর্ষণের বশীভূত হ'ল।

কিসের এই দুর্নিবার আকর্ষণ? এ আকর্ষণ তো শত শত বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলকেই স্ত্রী-পুরুষ-জাতি-বর্ণ-বয়স-পদমর্যাদা-নির্বিশেষে মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হ'তে বাধ্য করে—দৃঢ়-কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকেও বৈষয়িক বাধ্যতামূলক নিত্য-অভ্যস্ত কর্তব্য থেকে বিচলিত করে। কর্ষয়তি ইতি কৃষ্ণঃ। সুতরাং, প্রধানতঃ এই অতিব্যাপক সর্বনাশা, প্রাণ-ছেঁড়া আকর্ষণই আমাকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিল যে—মা ও কৃষ্ণ অভেদ।

এ কয়দিনের জন্য আমার ও ছবির-মায়ের প্রোগ্রাম হ'ল —ছবিও অনেক সময়ে আমাদের সঙ্গে থাক্‌তো—সকালে ৭টা থেকে রাত্রি দেড়টা-দু'টা পর্যন্ত, যতক্ষণ পারা যায়, মায়ের সঙ্গে থাকা। আমার নিজের ধারণা—এ সময়ে (এখন মনে হয়, সর্বকালে) মা ছিলেন একেবারে বিনিদ্র। তবে, শেষরাত্রে দু'-তিন ঘণ্টা চুপ্-চাপ্ শুয়ে থাকতেন—আমরা যারা কিছুটা না-ঘুমিয়ে পারতাম না— তাদের ঘুমাবার সুযোগ দেওয়ার জন্য।

প্রথম তিন দিন, ছবির-মা ও আমি দুপুরে একবার বাড়ী গিয়ে—যেমন-তেমন-ভাবে আহারাদি সেরে, মায়ের তাঁবুতে ফিরতাম ২টা-তিনটার মধ্যে। অবশ্য, সন্ধ্যায়, আমি একলা আর একবার বাড়ী গিয়ে—আমাদের পূজার চৌকিতে পিতলের নাড়ুগোপাল মূর্তি ছিলেন—তাঁকে শীতল দিয়ে এবং গৃহে পরিত্যক্ত পুত্রকন্যাদের দায়-সারা-গোছের কিছুটা তত্ত্বাবধান ক'রে রাত্রি ৮টার মধ্যেই মায়ের তাঁবুতে ফিরতাম। চতুর্থ দিনে, ১৩ নম্বর ক্যান্টন্‌মেন্ট্ রোডের গৃহস্বামী পঞ্চুবাবু আমাকে ব'ললেন,—আপনারা দু"জন শুধু দুপুর বেলা আহারের জন্য বাড়ী যান। আজ থেকে আর বাড়ী যাবেন না—এখানেই প্রসাদ পাবেন। কৃতজ্ঞচিত্তে, বিনা-দ্বিধায় তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। সেইজন্য শেষের তিন দিন প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে মাতৃসঙ্গ করবার সুযোগ পেলাম।

সব সময়ে অবশ্য মা'-কে তাঁবুতে পেতাম না। বিকালে,

প্রায় প্রত্যহ, মা দু'-তিন-ঘণ্টা-কাল মোটর ভ্রমণে যেতেন। সকালেও, প্রায় প্রতিদিনই মা দু'-এক ঘণ্টার জন্য বিশিষ্ট ভক্তদের নিমন্ত্রণে, তাঁদের বাড়ীতে যেতেন। তাঁবুতে মায়ের অনুপস্থিতির সময়ে, মায়ের নির্দেশে, আমরা অনেকে সচ্চিদানন্দ-খেলায় যোগ দিয়ে, খেলায় জিৎ হ'লে নাম-কীর্তন, এবং হার হ'লে নাম-জপ করতাম। যতদূর মনে পড়ে, খেলাটা ছিল এই রকম।

সাতটা কড়ি নিয়ে খেলা হ'ত। কড়িগুলি সব এক হাতে নিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলতে হ'ত। মনে হচ্ছে, তিনবার কড়ি ফেল্‌বার সুযোগ প্রত্যেকে পেতেন। ভাগ্যক্রমে, যাঁর সাতটা কড়িই চিৎ-ভাবে প'ড়তো, তাঁর হ'ত 'জিৎ', এবং কীর্তন করার অধিকার। যিনি তিনবার চেষ্টা ক'রেও, সাতটা কড়ির সবগুলোই একবার চিৎ-ভাবে ফেল্‌তে অপারগ হ'তেন, তাঁর হ'ত 'হার', এবং তাঁকে চুপ্‌-চাপ্‌ ব'সে নাম-জপ ক'রতে হ'ত। অর্থাৎ, খেলার অছিলায় মা তাঁর সন্তানদের নিয়োজিত ক'রতেন, হয় কীর্তনে, আর না-হয় নাম-জপে। এ'তে, আজে-বাজে কথা বলা বা গল্প করা বন্ধ হ'য়ে যেত।

মা-ও সন্তানদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য, মাঝে মাঝে নিজে এই সচ্চিদানন্দ-খেলায় যোগ দিতেন। একটা অভাবনীয় লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল এই যে, মা যেমন-খুসী কতকগুলো কড়ি চিৎ- আর বাকিগুলো উপুড়-ভাবে ডান-হাতের তেলোয় সাজিয়ে নিয়ে, যেমন-তেমন ক'রে ফেল্‌লেই, সাতটা কড়িই সুশীল-সুবোধ বালকের মতো চিৎ-ভাবে প'ড়তো। ভুলেও

কখনও একটা কড়িও উপুড়-ভাবে পড়তো না। আমরা কিন্তু, মায়ের অনুকরণে, হাতের তেলোয় কড়ি সাজিয়ে নিয়ে ফেলে, অনেক চেষ্টাতেও কদাচিৎ সাত-চিৎ পেতাম। আমরা সকলেই বিস্মিত হ'তাম এই ভেবে যে—অচেতন কড়িগুলোও মায়ের একান্ত আজ্ঞাকারী।

এ সময়কার ঘটনা কিছু কিছু—যতটা মনে পড়ে—উল্লেখ করছি।

একদিন সকালে, মা ছুর্গাদাসবাবুর পুত্র বীরেনকে বল্‌লেন, —বাড়ী গিয়ে তোর বাবাকে বল্—আমি ডেকেছি। তোর বাবা এলেই, আমাকে তাড়াতাড়ি জানাবি। খানিক বাদে, টাঙ্গাতে ছুর্গাদাসবাবুকে নিয়ে বীরেন ফিরে এল। ছুর্গাদাস বাবু মোটা-সোটা ছিলেন। তাঁর পায়েও বাতের ব্যথা ছিল। তিনি ধীরে-সুস্থে মায়ের তাঁবুতে পৌঁছুবার আগেই, বীরেন, ত্বরিত-গতিতে এসে মা-কে জানিয়ে দিল,—বাবা এসেছেন। তৎক্ষণাৎ, মা একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে প'ড়লেন—ভাণ ক'রলেন, যেন তিনি ঘুমুচ্ছেন। তাঁবুতে ঢুকে, মা-কে ঐ ভাবে শয়ান দেখে, কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'রে, ছুর্গাদাস বাবু তাঁর স্বাভাবিক চড়া-গলায়, আদরের সুরে ব'লে উঠলেন,—বেটি, চালাকি করার আর জায়গা পাও না? ব'লেই, একটু নীচু হ'য়ে, মায়ের গায়ের চাদরটা একটানে তুলে ফেল্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে, মা-ও 'হা-হা-হা' অট্টহাস্য ক'রে উঠে ব'সলেন। তখনই আবার মায়ের পায়ের ধূলো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ছুর্গাদাসবাবু হুকুম ক'রলেন,—মা, পা-ছুটো একটু

উঁচু করো,—জানো না, আমার বাত্ আছে, নীচু হ'তে পারি নে ? সন্তান-বৎসলা হাস্যময়ী মা-ও চরণ-দু'খানি একটু উঁচু ক'রে তুলে, ঐ "উৎপেতে" ভক্তকে চরণ-স্পর্শ দিয়ে শান্ত ও ধন্য ক'রলেন।

একদিন সন্ধ্যায় মা পিনাকপাণি বাবুর বাড়ী গিয়েছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। পিনাকবাবু মা-কে নিবেদন ক'রেছিলেন,—মা, পরমহংসদেব গিরীশ ঘোষের ভার নিয়েছিলেন, আপনি আমার ভার নিন্। মা বলেছিলেন, —বাবা, পরমহংসদেব ক'জন গিরীশ ঘোষের ভার নিয়েছিলেন ? গিরীশ ঘোষের মতো বিশ্বাস ক'জনের হয় ?

এ যাত্রায় মায়ের সঙ্গে এসেছিলেন,—ভোলানাথ, অখণ্ডানন্দস্বামী (*) ভাইজী (†), গুরুপ্রিয়া দিদি (‡) ও ক'লকাতার অ্যাড্ভোকেট্ যতীশচন্দ্র গুহ।

এ কয়দিনের মধ্যে একদিন অনেকগুলি ভক্তসঙ্গে মা বাসে ক'রে ওখ্লায় গিয়েছিলেন। আর একদিন মা, পুষাতে সরকারী গো-শালা দেখে এলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজীর অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল—মা-কে একবার এরোপ্লেন চড়াবার। একদিন, মা ভোলানাথ ও স্বামীজির সঙ্গে এরোড্রোমে গিয়ে

---

* অখণ্ডানন্দ স্বামীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায়। ইনি সিভিল সার্জন ডাক্তার ছিলেন।

† ভাইজীর কর্মজীবনে নাম ছিল জ্যোতিষচন্দ্র রায়। ইনি সরকারী কৃষি-বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

‡ গুরুপ্রিয়া দিদি ছিলেন অখণ্ডানন্দ স্বামীর আজন্ম-সংসার-বিরাগিণী কন্যা।

কয়েক মিনিটকাল এরোপ্লেন্-ভ্রমণ ক'রে এলেন। আর এক দিন তুপুরের পরে গুরুদ্বারার হল্-ঘরে, শুধু মেয়েদের নিয়ে, মা তিন-চার ঘণ্টা কীর্তন ক'রেছিলেন। এই কীর্তনে আমার কন্যা ছবি ও তার মা অংশগ্রহণ ক'রেছিলেন। ঐ কীর্তনের পদ ছিল ঃ

"রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে।
ঐ নাম বল বদনে, শুনাও কানে,
বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে ॥"

আর একদিন সন্ধ্যায় হিন্দু মহাসভার সুবৃহৎ হল্-ঘরে হারাণবাবু ও সুধীরবাবু-প্রমুখ দিল্লীর কীর্তনের দল ভোলানাথকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের সাম্‌নে জোর নাম-কীর্তন করেন ঃ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ,
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ ॥"

প্রথম তিন-চার দিন লক্ষ্য ক'রলাম,—প্রত্যহ বিকালে কোনও-না কোনও ভক্ত মোটরে ক'রে মা-কে বেড়াতে নিয়ে যান। মায়ের সঙ্গে প্রায়ই যেতেন মোটরের মালিক ও তাঁর সহধর্মিণী এবং আরও তু-তিনজন মায়ের পুরানো ভক্ত, যাঁরা মায়ের সঙ্গে এসেছেন। পঞ্চম দিনে আমার তীব্র ইচ্ছা হ'ল যে, আমিও মায়ের সঙ্গে মোটর-ভ্রমণে যাবো। আমার তো নিজের মোটর ছিল না,—সুতরাং মোটরে মায়ের সঙ্গে ভ্রমণ করার আমার সাধ ছিল—বামনের চাঁদ-ধরার তুরাকাঙ্খার মতো তুষ্পূরণীয়। কিন্তু, আমার এই আকাঙ্খা এতো প্রবল হ'ল যে,—ঐ দিন মা মোটর-ভ্রমণে যাওয়ার প্রাক্কালে, আমি

মরিয়া হ'য়ে, ছবিকে সঙ্গে নিয়ে, গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম যে,—অপেক্ষমান মোটর-গাড়ীখানা, ইতিমধ্যেই, মাতৃ-সঙ্গে মোটর-ভ্রমণেচ্ছু ভক্তে প্রায় পূর্ণ। মা গেটের বাইরে রাস্তার ধারে আসতেই,—আমার বোধ হয় কিছুটা মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছিল,—আমি নিঃসঙ্কোচে হিন্দীতেই ব'লে ফেল্‌লাম,—মা, আজ তোমারা সাথ্ হাম যায়েঙ্গে। মা-ও আমার দিকে চেয়ে হিন্দীতেই বলেছিলেন,—আচ্ছা, জায়গা হোয়েগা তো জায়েগা। এরপরে মা মোটরে-আগে-থেকে-বসা সকলকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন,—তোমরা তো রোজ যাও, তোমরা নামো, আজ এরা যাবে। গাড়ী এইভাবে খালি হ'য়ে গেলে, মা পিছনের সিটে ডান্ দিকে বস্‌লেন, এবং মায়েরই ব্যবস্থা-মতো আমি মাঝে বসলাম, এবং একটি নূতন আমেরিকান্ ভক্ত বসলেন আমার বাঁদিকে। আর জায়গা খালি না থাকায়, ছবিকে আমার কোলেই বসিয়ে নিলাম। সাম্‌নের সিটে ভোলানাথ ছিলেন—বেশ মনে আছে।

প্রথমে মোটর ঢুকলো রায় বাহাদুর দেবেন্দ্র চাটুজ্যের বাংলো-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ডে। সেখানে সবুজ লন্, সুন্দর ফুলের কেয়ারী, সজ্জিত বৃক্ষশ্রেণী। সবুজ লন্-এর উপর একটি মূল্যবান গালিচা বিছানো ছিল। সেই গালিচার উপর মা-কে বসানো হ'ল। আমরা সব মায়ের চারি দিক্ ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলাম। এখানে দেবেনবাবুর সহধর্মিণী তরুদিদি (*)

* দেবেনবাবু শিবপুর কলেজে আমার উপরে পড়তেন। এক বৎসর আমি তাঁর সঙ্গে একই হোষ্টেলে ছিলাম। সেই সূত্রে দেবেনবাবুর সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। তাঁর স্ত্রী তরুদিদির সঙ্গে ছবির-মায়েরও ঘনিষ্ঠতা ছিল।

নিজ-হাতে-তৈরী সন্দেশাদি নানা মিষ্টান্ন একটা থালায় সাজিয়ে এনে মা-কে খাওয়াবার চেষ্টা ক'রলেন। এক টুক্‌রা সন্দেশ মায়ের মুখের কাছে আনতেই মা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি বললাম,—দিদি, গ্রাস আরও ছোট কর। তরুদিদি গ্রাস ছোট ক'রে নিয়ে, আবার মায়ের মুখের কাছে ধরলেন। কিন্তু এবারেও মা মুখ খুললেন না, মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পরে,—মা কেন খাচ্ছেন না,—বুঝতে না পেরে, ভয় ও উৎকণ্ঠায় গৌরবর্ণা তরুদিদির কপালে ও মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। উপস্থিত আমাদের সকলেরই ঐ এক চিন্তায় ভয় ও উৎকণ্ঠা হ'য়েছিল। হঠাৎ, মা ব'ললেন,—বাচ্চাকে কি ঐ রকম ক'রে খাওয়ায় ? মাথায় হাত দাও, তা' হ'লে হাঁ ক'রবে'খন। একথা শুনে তরুদিদি তাঁর বাঁ হাত-খানা মায়ের মাথায় রাখতেই মা মুখ খুললেন। তখন তরুদিদি স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে মা-কে খাওয়ালেন। বলা বাহুল্য, আমরাও সকলে প্রসাদ পেলাম।

সেদিন, দেবেনবাবুর বাংলো থেকে বেরিয়ে, মায়ের সঙ্গে অনেক রাস্তা ঘুরে, প্রায় দু'ঘণ্টা বাদে, আমরা মায়ের তাঁবুতে ফিরেছিলাম। পথে, আমেরিকান্ ভক্তটি আমার মাধ্যমে ইংরেজীতে মা-কে কয়েকটা প্রশ্ন ক'রেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল,—গান্ধীজি আজ কাল যেসব আন্দোলন ক'রছেন, তা'তে দেশের কোনও মঙ্গল হবে কি ? মা-কে কিছু না জানিয়ে, নিজ-বুদ্ধিতে আমি ব'ললাম,—মা এ-সব রাজনৈতিক প্রশ্নের কোনও উত্তর দেন না। ধর্ম-বিষয়ে আপনার কোনও

প্রশ্ন থাক্‌লে, মা তার জবাব দেবেন। মা ইংরেজী জানেন না ব'লেই জান্‌তাম। কিন্তু একটু মৃদু ধমক্‌-দেওয়ার ভাবে আমাকে যা' ব'ললেন, তা'তে বুঝলাম,—মা, ঐ আমেরিকান্‌ ভক্তের প্রশ্ন এবং তাঁকে আমি যা' বলেছি, সবই বুঝেছেন। আমাকে প্রশ্ন ক'রলেন,—ও আমাকে কি প্রশ্ন করেছিল, এবং তুমি কি জবাব দিলে? সব কথা মা-কে ব'ললাম। তা'তে মা ব'ললেন—ও রকম জবাব দিলে কেন? বলো, গান্ধীজি যা' করছেন, ভগবানের ইচ্ছাতেই ক'রছেন, এবং তাতে' দেশের কল্যাণ হবে। আমেরিকান্‌ ভক্তকে ঐ কথা জানাবার পরে, তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন ক'রলেন,—মায়ের বাণী (message) কি? মা'কে প্রশ্নটা জানাতেই, মা বললেন,— বলো, বাণী বা উপদেশ সকলের জন্য এক নয়। মায়ের ঐ উত্তর শুনে আমেরিকান্‌ ভক্ত শেষ প্রশ্ন করলেন,—আমার জন্য মায়ের কি উপদেশ? মা ব'ললেন,—বলো,—অপেক্ষা কর, সময়ে জানতে পারবে।

মোটর-ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে দেখি,—মায়ের তাঁবুতে অসম্ভব ভিড়। কারণ, পরের দিনে মায়ের বেরিলি যাওয়ার কথা স্থির হ'য়েছে। অনেকরাত্রি পর্যন্ত মাতৃসঙ্গের অনাবিল আনন্দ উপভোগ ক'রে রাত্রি প্রায় ২টায় আমরা বাড়ী ফিরেছিলাম।

পরের দিনে (৩১শে মার্চ ১৯৩৭), একজন ফটোগ্রাফার সঙ্গে নিয়ে, সকাল প্রায় ৮টায় আমরা মায়ের তাঁবুতে উপস্থিত হ'লাম। ছবির-মা কিছু বাড়ীর-তৈরী মিষ্টান্ন এবং

মায়ের জন্য নূতন এক সেট্ পরিধেয়—সরু পাড় ধুতি, জামা, চটিজুতা, প্রভৃতি—সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁবুর পিছনের ছোট কামরায় একটা চৌকির উপরে মা ব'সেছিলেন। প্রথমে, কাপড় ছাড়াবার আগে ছবির-মা আমাকে বাইরে যেতে ব'ললেন। তা'তে মা ব'ললেন,—বাবা তো, লজ্জা কি? আমি মায়ের দিকে পিছন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। পরিধেয় সব পরিবর্তনের পরে, মা ছবির-মাকে ব'ললেন, জামাটা বাবা নেবে, অন্য সব তুমি নিও। ঐ জামা, ধুতি, প্রভৃতি সব ছবির-মায়ের কাছে ঊনচল্লিশ বৎসর যাবৎ সযত্নে রক্ষিত আছে।

এইবারে ছবির-মা মা-কে মিষ্টান্ন খাওয়াতে সুরু ক'রলেন। তিনি দু'তিন গ্রাস খাওয়ানর পরেই, আমার প্রবল ইচ্ছা হ'ল মা-কে নিজের হাতে একটু খাওয়াবার। মায়ের অনুমতি নিয়ে, ডান্ হাত ধুয়ে, ডান্ হাতে এক টু'ক্‌রা মিষ্টান্ন নিয়ে মা-কে খাওয়াতে গিয়েই, আমার আগের দিনে, তরুদিদির মিষ্টান্ন খাওয়ানর কথা মনে পড়ে গেল। আমি বাঁ হাত-খানা মায়ের মাথার উপরে রাখ্‌তেই, মা খাবার জন্য মুখ খুললেন। আমিও অমনি ডান হাতের মিষ্টান্নটুকু মা-কে খাইয়ে দিলাম। ঐ একটু খাইয়েই আমার খাওয়ানোর ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হ'ল। আমি একটু স'রে গিয়ে, ছবির-মাকে ব'ললাম,—আমি আর খাওয়াবো না, এবারে তুমিই খাওয়াও।

খাওয়ানো শেষ হ'লে, আমি মায়ের কাছে—ছবির-মায়ের ও আমার একটা গুরুতর নূতন সমস্যা—সুষ্ঠু সমাধান পাবার

আশায়—মায়ের সামনে উপস্থাপিত ক'রলাম। আমি ব'ললাম,—মা, তোমাকে দর্শন করার পরে, আমরা যে আমাদের পুরাতন ইষ্ট গোপালের ধ্যান ক'রতে পারছি না, —তোমার মূর্তি এসে গোপালের মূর্তিকে আড়াল ক'রছে—এতে কি আমাদের কোনোও অকল্যাণ হবে? মায়ের উত্তর ছিল পরিষ্কার, দ্বিধাহীন। মা ব'ললেন,—অকল্যাণ হবে কেন? যে আসছে, তা'কে আসতে দাও।

এরপরে, ছবির-মা মায়ের এলোচুল চূড়ো ক'রে মায়ের মাথার ওপরে জড়িয়ে দিয়ে, তার ওপরে ফুলের মালার বেড় দিয়ে, এবং কপালে ও দুই গালে চন্দনের তিলক্ দিয়ে, মা-কে কৃষ্ণ সাজালেন। ঐ ভাবে সাজিয়ে, মা-কে নাড়ুগোপালের ভঙ্গিতে একটা পায়ের হাঁটু উঁচু ক'রে বসিয়ে, যখন ফটো তোলার উদ্যোগ হচ্ছিল, তখন পাশের একটি বাড়ীর মেয়েরা কৌতুহলী হ'য়ে দূর থেকে মায়ের দিকে দেখছিল। মা, তাদের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে, মিষ্টি হেসে, শিশুর মতো ব'ল্লেন,—ঐ ওরা দেখছে, আমার বুঝি লজ্জা করে না?

ঐ দিনকার ঐ ফটো বাঁধিয়ে আমাদের পূজার চৌকির ওপর আমাদের পুরানো গোপাল-মূর্তির পাশে রেখে নিত্য পূজা করা হয়। (ঐ ফটোর প্রতিকৃতিই এই পুস্তিকাতে দেওয়া হ'য়েছে)। ফটো-তোলার সময়ে মা-কে বলেছিলাম,—মা, তুমি তো চলে যাচ্ছ, এই ফটোতে তোমাকে ধ'রে রাখবো। তা'তে মা ব'লেছিলেন,—ফটোতে কতটুকুই বা

পা'বে ? মা চলে যাওয়ার পরে, কতবার ঐ ফটো দেখেছি, কিন্তু রক্ত-মাংসের-শরীর-ধারিণী জীবন্ত সচলা মধুময়ী জ্যোতির্ময়ী, আমাদের চির-আনন্দময়ী মায়ের কতটুকুই বা ফটোতে পেয়েছি ?

ঐ দিনই মা সদলে বেরিলি রওনা হবেন। স্ত্রী-পুরুষ বহু ভক্ত এসেছেন দিল্লী স্টেশনে মা-কে বিদায়-প্রণাম জানাতে। ছবিকে ও ছবির-মাকে সঙ্গে নিয়ে আমিও প্ল্যাট্‌ফর্মে উপস্থিত হ'লাম। আর সকলেই একখানা ক'রে এক আনা দামের প্ল্যাট্‌ফর্ম-টিকিট কিনেছিলেন। আমি কিন্তু বারো আনা খরচ ক'রে তিনখানা গাজিয়াবাদের থার্ড-ক্লাসের টিকিট্ কিনে ছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল—গাজিয়াবাদ পর্যন্ত—এগারো মাইল রাস্তা—মায়ের সঙ্গে ট্রেণে যাওয়ার। ঐ সময়ে মা থার্ড ক্লাসেই ট্রেণে যাতায়াত ক'রতেন।

প্ল্যাট্‌ফর্মে কোনোও ভক্ত একঝুড়ি কমলালেবু এনেছিলেন। মা স্বহস্তে সকলকে কমলালেবু বিতরণ ক'রতে লাগলেন। একবার শুধু ব'ললেন,—কেউ একটার বেশী নিও না। দেখে আশ্চর্য হ'লাম—যখন ঝুড়ির কমলা লেবু নিঃশেষ হ'ল, তখন উপস্থিত সকলেই একটা ক'রে কমলা লেবু পেয়েছেন। এমন কি, যে কামরায় মা উঠবেন, তা'তে আমাদের অপরিচিত দু'জন যাত্রী ছিলেন, তাঁরাও একটা ক'রে কমলালেবু পেয়েছেন।

যে ট্রেণে মা যাবেন, সেই ট্রেণটার রাত্রি প্রায় দশটায় গাজিয়াবাদ পৌঁছুবার কথা। ঐ সময়ের প্রায় দশ মিনিট

পরে, একটা ট্রেণ গাজিয়াবাদ থেকে দিল্লী আসার কথা। ঐ ট্রেণে আমরা গাজিয়াবাদ থেকে দিল্লী ফিরবো—ঐ রকম আমাদের প্ল্যান ছিল। কিন্তু, দিল্লী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অতিরিক্ত ভিড় হওয়ায়, মায়ের ট্রেণটা বেশ কিছু দেরীতে ছাড়লো। ট্রেণ ছাড়ার আগে, আর সব ভক্ত একে একে মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে, মায়ের কামরা থেকে নেমে গেলেন। শুধু আমরা তিনজনে ঐ কামরাতে ব'সে, মায়ের সঙ্গে চললাম গাজিয়াবাদের দিকে। ট্রেণটা দিল্লী থেকে দেরীতে ছাড়ায়, গাজিয়াবাদ পৌঁছুবার আগেই গাজিয়াবাদ থেকে যে ট্রেণ দিল্লী আসার কথা, সেই ট্রেণ গাজিয়াবাদ স্টেশন থেকে দিল্লীর দিকে বেরিয়ে এল। ঐ সময়ের কাছাকাছি গাজিয়াবাদ থেকে দিল্লীগামী কোনোও ট্রেণ না থাকায়, আমরা মায়ের সঙ্গে আলিগড় (গাজিয়াবাদ থেকে ৭৩ মাইল) পর্যন্ত যাওয়া স্থির ক'রলাম। তা'হ'লে আরও অন্ততঃ দু'ঘণ্টা মায়ের সঙ্গে থাকতে পারবো।

ট্রেণের কামরায় একটা বেঞ্চের উপরে মায়ের সামান্য বিছানা পাতা হয়েছিল। মা শুয়ে প'ড়লেন। গুরুপ্রিয়া-দিদি মায়ের সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর কাহিনী আমাদের শোনালেন। ট্রেণেই আমি মা-কে প্রশ্ন ক'রেছিলাম,—মা, কাজের অবসরে, যদি দু'-চার দিনের জন্য, তুমি যেখানে থাকো, তোমার কাছে যাই, তুমি কি বিরক্ত হবে? মা উত্তর ক'রলেন, —বাবা, তোমার কি রকম প্রশ্ন হ'ল? এদিকে ব'লছ 'মা', আবার বলছ 'বিরক্ত' হব। এই উত্তর পাবার পরে, বিভিন্ন

স্থানে (ঢাকায়, জলপাইগুড়িতে, কাশীতে, বিন্ধ্যাচলে, এলাহাবাদে, ঝুঁসীতে, ডেরাডুনে, রাইপুরে, হরিদ্বারে, বৃন্দাবনে, বেরিলিতে, আলমোড়ায়, বোম্বেতে, পুণায়, আমেদাবাদে, চান্দোদে, সীতারামপুরে, আজিমগঞ্জে, বহরমপুরে, নবদ্বীপে, হাজারিবাগে) কোনও অনুমতি না-নিয়ে, এবং বহির্দৃষ্টিতে একেবারে না-জানিয়ে, যখনই সুযোগ পেয়েছি, মায়ের কাছে হাজির হ'য়েছি। সব সময়েই, আমাকে দেখে, মিষ্টি হাসির মাধ্যমে আন্তরিক স্বাগত জানিয়ে, মা কুশল জিজ্ঞাসা ক'রেছেন। বিরক্তি, অবহেলা বা বিমনা-ভাবের লেশমাত্র তাঁর চেহারায় কখনও দেখিনি। দীর্ঘ উনচল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমি এখন এই পরম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, মায়ের প্রত্যেকটি ভক্ত কায়মনে বিশ্বাস করে যে, মা তা'কে খুব ভালবাসেন, সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন। সাধারণ-দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হ'লেও এটা একটা বাস্তব সত্য।

রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটায়, ট্রেণ আলিগড়ে থামলে, আমরা সকলে নামলাম এবং কাছেই অন্য প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমাণ বেরিলি-গামী ট্রেণে মা-কে সদলে তুলে দিলাম। ঐ ট্রেণটা যখন সবেমাত্র ছেড়েছে, তখনই মা গুরুপ্রিয়া-দিদিকে বললেন, —খুকুনি, শিগগির ওদের একটা কম্বল দে। তাড়াতাড়ি মায়ের-বিছানা-জড়ানো কম্বলটা খুলে নিয়ে গুরুপ্রিয়া-দিদি যখন জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন—এবং আমি সেটা লুফে নিলাম—তখন ট্রেণের গতিবেগ বেশ দ্রুত হয়েছে। মা একটু

উচ্চকণ্ঠে ব'ললেন,—বাবা, ওটা পেতে ব'সো। কিন্তু মায়ের-দেওয়া কম্বলটা আমরা প্রাণ ধ'রে পাত্‌তে পারি নি। তিনজনই একে একে কম্বলটার সুগন্ধ আঘ্রাণ ক'রলাম ও কম্বলটা মস্তকে ধারণ ক'রলাম। ঐ সব দিনে, মায়ের হাতে, পায়ে, সর্বাঙ্গে এবং পরিধেয় ও ব্যবহৃত সবকিছুতে একটা হাল্‌কা ফুলের সুগন্ধ সর্বদাই পাওয়া যে'ত। এ সম্বন্ধে, মায়ের তখনকার ভক্ত আমরা সকলেই একমত ছিলাম।

ঐ রাত্রে, প্রায় ১টা থেকে ৪টা—তিন ঘণ্টা সময় আমরা তিনজন আলিগড় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বেঞ্চে ব'সে কাটালাম। তারপরে, দিল্লীগামী ট্রেণে চেপে সকাল ৭টায় দিল্লী পৌঁছুলাম। সেদিন ছিল শুক্রবার, ১লা এপ্রিল, ১৯৩৭।

আগের দিন, দিল্লী স্টেশনে গাজিয়াবাদের তিনখানা টিকিট্‌ কেনার পরে, আমার কাছে টাকা-পয়সা বেশী ছিল না। গাজিয়াবাদ থেকে আলিগড় পর্যন্ত তিনজনের ট্রেণভাড়া ও জরিমানা, আবার আলিগড় থেকে দিল্লী ফিরে আসার ভাড়া এবং জরিমানা (বিনা টিকিটে ভ্রমণের জন্য) দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু, মায়ের কৃপায়, রেলকর্মচারী কেউই আমাদের কাছে ভাড়া বা জরিমানা চায়নি। দিল্লী স্টেশনেও কেউ টিকিট্‌ দেখতে চায় নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেরিলিতে দু'দিন

(৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল ১৯৩৭)

মা সদলে নিউদিল্লী ত্যাগ করেন ৩১শে মার্চ ১৯৩৭, বিষ্যুদ্‌বারে। রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টায় দিল্লী স্টেশন থেকে ছেড়ে, রাত্রি প্রায় পৌনে একটায় আলিগড়ে ট্রেণ বদল ক'রে, মা বেরিলি পৌঁছেছিলেন শুক্রবারে সকালে। ঐ দিনই পঞ্চুদার (পৃষ্ঠা ১) কাছে ভোলানাথের টেলিগ্রাম আসে। তা'তে ভোলানাথ চেয়েছেন—যেন দিল্লীর কীর্তনের দল বেরিলি গিয়ে রবিবারে নাম-কীর্তন করে। ঐ দলের সঙ্গে পঞ্চুদার সুগায়িকা ও নৃত্যপটিয়সী কিশোরী কন্যাকেও নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ছিল। টেলিগ্রামের নির্দেশ-অনুযায়ী ১৪।১৫ জনের কীর্তনের দলের সঙ্গে পঞ্চুদার কন্যা, ছবি ও ছবির-মাকে নিয়ে আমিও শনিবার রাত্রে রওনা হ'য়ে, রবিবারে (৩।৪।৩৭) সকালে বেরিলি পৌঁছে, স্টেশনের কাছেই যে ধর্মশালায় মা সদলে উঠেছিলেন, সেখানে গেলাম। ধর্মশালার একটা বড় হল্‌-ঘরে কীর্তনের জন্য মঞ্চ তৈয়ার করা হ'ল। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে, প্রায় বারোটার সময়ে, দিল্লীর দল তাঁদের অভ্যস্ত নাম-কীর্তন শুরু ক'রলেন—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ"।

২।৩ ঘণ্টা বাদে, মা-ও পার্শ্ববর্তী একটা ঘরে স্থানীয় মেয়েদের দিয়ে কীর্তন করালেন। রাত্রি প্রায় দশটায় দিল্লীর দল, পঞ্চুদার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধ'রে দিল্লী ফিরেছিলেন।

ছবি, ছবির-মা ও আমি পরের দিন সোমবারে—কিছুটা নিরালায় মাতৃসঙ্গ ক'রতে পারবো, এই আশায়—আর একদিনের জন্য মায়ের কাছে র'য়ে গেলাম। আমরা সোমবার রাত্রের ট্রেণে দিল্লী ফেরবার মতলব ক'রলাম। আমাকে নির্জনে পেয়ে, ঐ রাত্রেই মা আমাকে দু'বার পরীক্ষা ক'রলেন। প্রথমে ব'ললেন,—বাবা, আমি মা-কে (অর্থাৎ ছবির-মাকে) নিয়ে যাই ? ঐ রকম প্রশ্নের জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। আমি চুপ ক'রে রইলাম। কিন্তু, আমার অজ্ঞাতে, আমার চোখ ছল্ ছল্ করতে লাগলো। আমার অবস্থা দেখে, মা আমাকে এই ব'লে সান্ত্বনা দিলেন,—আমি হাসি ক'রছিলাম, আমি মা-কে নিয়ে যাবো কেন ? এই প্রথম পরীক্ষায় আমি অসহায়ভাবে ফেল হ'লাম। এরপরে, মা আমাকে ব'ললেন,—বাবা, তুমি কেন আজ গেলে না ? তোমার কি সোমবার ছুটি আছে ? কে-যেন মা-কে ব'ললেন যে, আমার নিজেরই কলেজ, সুতরাং আমি যথেচ্ছা অনুপস্থিত থাকতে পারি। তা' শুনে মা ব'ললেন, ওঃ, তোমার নিজের কলেজ ? তা' হলে, তোমার আরও খেয়াল ক'রে কাজে উপস্থিত থাকা উচিত। তুমি উপস্থিত না হ'লে তোমার অধীনস্থ লোকেরা কি মনে ক'রবে ? আমি ব'ললাম,—মা,

আমার অধীনে যারা কাজ করে, তাদের দরকার হ'লেই ছুটি দিই এবং তাদের কাজ আমি যথাসাধ্য নিজেই করি। আজ আমার দরকারে আমি যদি একদিন ছুটি নিই, তারা কি আমার কাজ ক'রবে না? আমার উত্তর শুনে মা হেসে ব'ললেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, থাকো। এই পরীক্ষায় আমি অবশ্য পাশ হ'লাম। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলাম যে, মা একটুও চান-না যে, তাঁর ভক্তরা কেউ সাংসারিক কর্তব্য কোনও প্রকারে একটুও অবহেলা করে।

ঐ রাত্রে ধর্মশালার প্রশস্ত বারান্দায়, মায়ের নির্দেশিত স্থানে, মায়ের বিছানার একদিকে শোবার প্রথম সুযোগ পেলাম। মায়ের শয্যার শিওরের দিকে—আমার মাথা মায়ের দিকে ছিল—এত কাছে আমি শুয়েছিলাম যে, মা যদি অসাবধানে একটু হাত বাড়াতেন, আমি মায়ের স্পর্শ পেতাম।

শোবার আগে আমি মা-কে ব'লেছিলাম,—মা, তোমার কাছে শুতে আমার সংকোচ হচ্ছে এই ভেবে যে, ঘুমুলে আমার বড্ড নাক ডাকে, তা'তে তোমার অসুবিধা হ'বে। স্নেহময়ী মা ব'লেছিলেন,—বাবা, তুমি শোও, আমার কোনো অসুবিধা হ'বে না।

পরদিন সোমবার (৪।৪।৩৭) সকালে, মা শয্যা ত্যাগ করার আগেই স্থানীয় মেয়েরা (বেশীর ভাগ পাঞ্জাবী ও কাশ্মিরী) নানারকম সুন্দর সাজ-সজ্জা ক'রে এসে, মায়ের শয্যার কাছে একত্রিত হ'য়েছিলেন। এঁরা সব ফুল ও মালা দিয়ে সাজিয়ে মা-কে প্রণাম ক'রে বেশ কিছুক্ষণ জোর কীর্তন

ক'রলেন। পরে, মা শয্যা ত্যাগ ক'রে, মুখ ধুয়ে, সামান্য কিছু খেয়ে, নিজের শয্যায় বসলে, ঐ সব মেয়েরা নেচে নেচে মা-কে প্রদক্ষিণ ক'রে, এবং নাচের তালে তালে সশব্দে করতালি বাজিয়ে কীর্তন করতে লাগলেন। কীর্তন ও নাচের সঙ্গে মেয়েরাই নিপুণ-হস্তে তবলা বাজাচ্ছিলেন।

এরমধ্যে একজন ভিখারী উপস্থিত হ'লে, মা আমাকে আদেশ ক'রলেন তা'কে কিছু লাড্ডু দেওয়ার জন্য। একটা বড় ঝুড়ি-ভর্তি প্রচুর লাড্ডু ছিল। একটা শালপাতার ঠোঙ্গাতে আমি তা'কে কিছু বেশী লাড্ডু দেওয়ার উপক্রম ক'রতেই, মা আমাকে সতর্ক ক'রে দিয়ে ব'ললেন,—কম ক'রে দাও, রাত্রে খরচ আছে।

ঐ দিন সকালে একসময়ে, মা যে-ঘরে ছিলেন, সেই ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় দেখলাম ভাইজীকে, কি-যেন লেখার কাজে ব্যস্ত আছেন। তাঁর কাছে ব'সতেই, তিনি ব'ললেন, —আমার কাছে কেন? যত বেশী সময় পারেন, মায়ের কাছে থাকুন। লক্ষ্য ক'রলাম যে, মা না-ডাকলে, ইনি মায়ের কাছে মোটেই আসেন না! মায়ের সঙ্গ ক'রে সকলের কল্যাণ হোক্ —এঁর এই নিঃস্বার্থ মনোভাব দেখে গভীর শ্রদ্ধায় এই মিতভাষী মাতৃভক্তের কাছে আমার মাথা সেদিন আপনিই নত হয়েছিল।

ঐ দিন একসময়ে, এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোক মায়ের কাছে এসে বলছিলেন যে, তাঁর পুত্রের বিয়ের জন্য দুটি পাত্রী দেখেছেন। উভয় পাত্রীর কিছু কিছু বিবরণ দিয়ে,

কোন্ পাত্রীটি ভাল হবে, সে সম্বন্ধে মায়ের অভিমত জানতে চাইলেন। বারবার অনুনয় করা সত্ত্বেও, মা কিছুতেই নিজের মত দিলেন না। বারবার একই উত্তর দিলেন,—বাবা, তোমার যা' মত আমারও তাই মত। এইভাবে নিজের অভিমত দেওয়াটা দৃঢ়ভাবে এড়িয়ে গেলেন। ভদ্রলোক বিদায় নেওয়ার পরে আমি মা-কে ব'ললাম,—মা, অত অনুনয় ক'রে ভদ্রলোক তোমার মত চাইলেন, তুমি তো জানো কোন্ সম্বন্ধটা ভালো, তুমি তোমার মত জানালে না কেন ?

মা বললেন,—বাবা, তুমি তো জান না, ও আমার মত ঠিক জানতে চায় নি। ওর মধ্যে একটা সম্বন্ধ ওর পছন্দ-মতো ; কিন্তু ওর বাড়ীর আর সকলের তা'তে অমত। ও চাইছিল, আমি যেন ওর পছন্দ-মতো সম্বন্ধটাই ভাল বলি। তা'হলে, আমার অভিমত ব'লে ওর নিজের পছন্দ-মতো পাত্রীকে ঘরে আনতে পারতো। ও আমার মত মানতো না, নিজের মতেই চ'লতো। তা'তে আমার মত না-মানার জন্য ওর আরও অকল্যাণ হ'ত। এ রকম ক্ষেত্রে, আমার মত দিয়ে ওর আরও বেশী অকল্যাণ হ'তে দিই কেন? এ ঘটনা থেকে আমার মনে হয় যে, মায়ের যে-কোনও ভক্ত যদি যে-কোনও বৈষয়িক সমস্যায় মায়ের নির্দেশ নির্বিচারে মানবেই—এই মনোভাব নিয়ে, মায়ের অভ্রান্ত, সুনির্দিষ্ট কল্যাণকর সমাধান বা নির্দেশ চায়, মা তাকে সাহায্য ক'রতে প্রস্তুত। এই তথ্য মায়ের-উপর নির্ভরশীল প্রত্যেকটি শরণাগত গৃহস্থ ভক্তের ভালভাবেই জানা আছে।

দুপুরে ছবির-মা আমাকে পাঠালেন, কাছাকাছি বাজার থেকে মায়ের জন্য কিছু ফল কিনে আনতে। ফল কিনে নিয়ে এসে দেখি, মায়ের দুপুরের ভোগ সমাপ্ত-প্রায়। সে সময়ে মায়ের ভুক্তাবশেষ প্রসাদ মায়ের নির্দেশ-মতো উপস্থিত কোনোও ভক্তকে পাত্র-সমেত (*) দেওয়া হ'ত। আমার আন্তরিক ইচ্ছা হ'য়েছিল ঐ দিন ঐ প্রসাদ পাবার—কারণ আমি জানতাম, পুরুষ-ভক্ত অপর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু দেখলাম—বেরিলির এক বাঙ্গালী-তরুণকে ঐ প্রসাদ দেওয়া হয়েছে। আমি গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াতেই, মা একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। গুরুপ্রিয়া-দিদি তখনই মা-কে খাওয়ানো সবেমাত্র শেষ ক'রেছেন। মা তাঁকে ব'ললেন,—খুকুনি (†), আমি আরও খাবো। একটা বড় বাটিতে, মায়ের আদেশে, ভাত মাখা হ'ল দুধ ও আমের রস দিয়ে। দিদি তা'-থেকে মা-কে খাওয়াতে লাগলেন। মাত্র দু'গ্রাস খাওয়ার পরেই, আমাকে দেখিয়ে মা আদেশ ক'রলেন,—ওকে দে। আমি আকাঙ্ক্ষিত বাটি-শুদ্ধ মায়ের ঐ ভুক্তাবশেষ প্রসাদ পেয়ে ধন্য হ'লাম। এই প্রথম বুঝলাম, —মা অন্তর্যামিনী, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু।

ঐদিন (সোমবার) রাত্রি পৌণে-দশটায় যখন দিল্লী

---

* এই প্রথা শীঘ্রই পরিবর্তিত হয়। মায়ের ব্যবহৃত পাত্রাদি অন্য কাউকে ব্যবহার ক'রতে দেওয়া নিষিদ্ধ হয়।

† 'খুকুনি' গুরুপ্রিয়া দেবীর আগেকার ডাক্-নাম। মা সে সময়ে গুরুপ্রিয়া-দিদিকে ঐ নামেই ডাকতেন।

ফেরবার জন্য, মা-কে প্রণাম ক'রে, আমরা তিনজনে বেরিলি স্টেশনের দিকে পা' বাড়ালাম, তখনও মায়ের সামনে স্থানীয় দলের কীর্তন পুরোদমে চ'লছিল।

দিল্লী-গামী ট্রেণ বেরিলি স্টেশন থেকে ছাড়বার কথা ছিল রাত্রি দশটায়। ট্রেণ স্টেশনেই দাঁড়িয়েছিল। আমরা টিকিট কেটে ঐ ট্রেণের একটা থার্ডক্লাশ কামরায় উঠে ব'সলাম। গাড়ীতে আদৌ ভিড় ছিল না। আমরা তিনজন ছাড়া, দু'-জন-মাত্র মুসলমান যাত্রী ঐ কামরায় ছিল। সুতরাং রাত্রে সকলেই একটা একটা পৃথক্ বেঞ্চে শুয়ে প'ড়েছিলাম। ট্রেণ কিন্তু রাত্রি ১২টা পর্যন্ত ছাড়েনি। খবর নিয়ে জানলাম— কোথায় নাকি রেলপথ ভেঙ্গে গিয়েছে, তাই ট্রেণ ছাড়তে দেরী হ'চ্ছিল। ১২টার পরে কখন আমি ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো, তখন দেখি, ট্রেণটা বেশ বেগেই চলছে। উঠে ব'সে, মায়ের কথাই অনন্যমনে চিন্তা ক'রতে লাগলাম। সেই চিন্তার মাঝে, সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়, আমার একটা আশ্চর্য অনুভূতি হ'ল। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কারা যেন মিলিত মধুর-উচ্চ কণ্ঠে কীর্তন করছে,—"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম"। ঐ নাম-কীর্তন আমি নিজে কখনও করিনি, বা শুনিনি। কিছুক্ষণ পরে কীর্তনের সুস্পষ্ট আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হ'য়ে আস্তে আস্তে যেন দূরে মিলিয়ে গেল। আমি তখন অতি-মাত্রায় বিস্মিত হ'য়ে ভাবতে লাগলাম,—ঐ কীর্তনের আওয়াজ কোথা থেকে এলো? কতকটা বিহ্বলভাবে ছবিকে ও ছবির-মাকে জাগিয়ে প্রশ্ন

করলাম,—তোমরা কি কীর্তন ক'রছিলে। আমার প্রশ্ন শুনে তারা অবাক্ হ'য়ে গেল। মুসলমান সহযাত্রী দু'টি তখনও নিদ্রিত ছিল। তাদেরও আমি ঐ প্রশ্ন ক'রতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মনে হ'ল—ওরা তো মুসলমান, ওরা ঐ কীর্তন ক'রবে কেন? তখন আবার স্থির হয়ে ব'সে চিন্তা ক'রে সিদ্ধান্ত করলাম,—ঐ সময়ে দূরে কোথাও ঐ নাম-কীর্তন হচ্ছিল। মায়ের কৃপায়, সেই কীর্তনেরই আওয়াজ কিছুক্ষণের জন্য আমার শ্রুতিগোচর হয়েছে।

* * *

৫ই এপ্রিল (১৯৩৭) মঙ্গলবারে সকালেই আমরা তিনজন আমাদের নিউদিল্লীর বাসায় ফিরে এলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

ক'লকাতায় চার দিন

(৬ই — ৯ই মে ১৯৩৭)

৬ই মে (১৯৩৭) প্রাতেই মা জেমসেদ্‌পুর থেকে ক'লকাতায় আসেন। ভাগ্যক্রমে ঐ সময়ে আমাকে ক'লকাতায় আস্‌তে হয়েছিল, নিজের একটা প্রয়োজনীয় কাজে। ক'লকাতায় বালিগঞ্জ রেস্‌-কোর্সের কাছে বির্লার ছোট সুন্দর শিব-মন্দিরে মা উঠেছিলেন। মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুন্দর শ্বেতপাথর-বাঁধানো নাটমন্দির ছাড়া, মন্দিরের সঙ্গে আছে একটা ঘর ও খোলা বারান্দা। নাটমন্দিরের শেষপ্রান্তে আছে একটি শ্বেতপাথরের অতি-সুন্দর দর্শনীয় বৃষ-মূর্তি।

ঐ সময়ে বালিগঞ্জে যতীশদা'-দের পার্ক-সাইড্‌ রোডের বাড়ীর উপরের হল্‌-ঘরে এবং সন্নিহিত একটা প্যাণ্ডেলে মায়ের জন্মোৎসব পালন করা হচ্ছিল। ঐ হল্‌-ঘরে মায়ের তু'খানা সুন্দর-ফ্রেমে-বাঁধানো সুবৃহৎ রঙ্গীন প্রতিকৃতি ছিল। উৎসবের কয়দিন ছবি-তু'খানা প্রচুর ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হ'ত। এই হল্‌-ঘরটা বাড়ীর একেবারে বাইরের দিকে ছিল ব'লে, মা এখানে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ ক'রতেন। সকালে বা তুপুরে, লোকের ভিড় কম থাকলে, এই হল্‌-ঘরে, এবং সন্ধ্যায় ও রাত্রে ভিড় বেশী হ'লে, প্যাণ্ডেলে অধিবেশন ব'স্‌তো। ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলি, দীনেশ ঠাকুর, নিবারণ সমাজপতি-

প্রমুখ বিখ্যাত কীর্তনীয়ারা এই সব অধিবেশনে কীর্তন ক'রেছিলেন।

সকালে, মা যতীশদা'-দের হল্-ঘরে স্তোত্রাদি-পাঠ ও নাম-কীর্তনে ছু'-এক ঘণ্টা-কাল উপস্থিত থাক্‌তেন। পরে আবার বির্লা-মন্দিরের নাট-মন্দিরে এসে ব'স্‌তেন। সেখানে, উপস্থিত পুরুষ ও স্ত্রী জনমণ্ডলীর সঙ্গে মা নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রতেন। কারও কোনোও প্রশ্ন থাকলে, তার উত্তর দিতেন।

একদিন সন্ধ্যায় প্যাণ্ডেলে দিলীপকুমার রায় ছু'খানা গান ক'রলেন। যাবার সময়ে তিনি ব'লে গেলেন যে,—বির্লা-মন্দিরে গিয়ে তিনি মা-কে গান শোনাবেন। যতীশ-দা যখন নিউদিল্লীতে মায়ের কাছে ছিলেন (পৃষ্ঠা ৮) সেই সময়ে তাঁর কাছে ক'লকাতা থেকে একখানা চিঠি আসে এই মর্মে যে, পণ্ডিচারি থেকে দিলীপবাবু ক'লকাতায় এসেছেন, মা-কে দর্শন করার জন্য। চিঠি-খানা যতীশ-দা আমাকে দেখিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে লেখা ছিল যে, মায়ের ফটো দেখিয়ে ছু'বার শ্রীঅরবিন্দকে মায়ের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। প্রথমবারে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন (*),—"the Mother Anandamayee of Dacca is the embodiment of beauty, purity and chastity, অর্থাৎ, ঢাকার মা আনন্দময়ী শ্রী, পবিত্রতা ও পাতিব্রত্যের জীবন্ত মূর্তি। পরে আবার লিখেন,—Mother Anandamayee remains in

---

* শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে আলাপ ক'রতেন না। ভক্তদের লিখিত-ভাবে প্রশ্ন ক'রতে হ'ত, এবং তিনিও লিখিত-ভাবে প্রশ্নের জবাব দিতেন।

the state of *Satchitananda*, অর্থাৎ, মা আনন্দময়ী সচ্চিদানন্দ অবস্থায় রয়েছেন। মায়ের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের ঐ দু'টো অভিমত জেনে, দিলীপবাবুর মা-কে দর্শন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়। ইনি মা-কে প্রথম দর্শন করেন হাওড়া স্টেশনে, অল্প সময়ের জন্য, যখন ২রা মে (১৯৩৭) তারিখে, কাশী থেকে হাওড়ায় এসে, মা জেমসেদ্‌পুরে যান।

প্রতিরাত্রেই প্যাণ্ডেলের অধিবেশন শেষ হ'লেই, মা-কে যতীশদা'-দের হল্‌-ঘরে নিয়ে গিয়ে, বিশিষ্ট ভক্তমণ্ডলী—বিশেষতঃ মেয়েরা—কখনও বা মা-কে কৃষ্ণ সাজিয়ে—মা-কে ঘিরে নেচে নেচে কীর্তন ক'রে, আরও নানারকমে মা-কে সেবা-পূজা ক'রে, আনন্দ ক'রতেন।

এইবারে ক'লকাতায় মায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট পুরানো ও নতুন ভক্তের সঙ্গে পরিচিত হ'লাম। এঁদের মধ্যে ছিলেন শচী-দা (শচীকান্ত ঘোষ, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইন্‌কাম্‌-ট্যাক্স কমিশনার), অটল-দা (*) (রাজসাহীর অধ্যাপক অটল

---

* অটলদা ছিলেন অতি-সরল-প্রকৃতি, যিনি নিজেকে মায়ের শিশু মনে ক'রতেন। তাই, রাজসাহীতে মা যখন তাঁর বাড়ীতে ছিলেন, ইনি নিঃসঙ্কোচে রাত্রে মায়ের আগেই শুয়ে পড়তেন। অসুস্থ অবস্থায় মাথা-গা-হাত-টিপে সেবাও নিয়েছেন মায়ের কাছ থেকে, স্নেহের দাবীতে, নির্দ্বিধায়। একদিন গ্রীষ্মের দুপুরে মা ও ভাইজী মুসৌরী থেকে ডেরাডুন আসার সময়ে রাস্তায় যখন তৃষ্ণার্ত হ'ন, তখন মা 'পরিষ্কার' দেখলেন যে "রাজসাহীতে অটল বেশ সুন্দর খণ্ড খণ্ড তরমুজ" কেটে কেটে ভোগে দিচ্ছে। তা' দেখেই মায়ের তেষ্টা মিটে গেল। (শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবীর 'মা আনন্দময়ী' গ্রন্থের পঞ্চদশ ভাগের ২৩২ পৃষ্ঠায় মায়ের ভাষায় এই ঘটনার বিবরণ আছে)। এই ঘটনায় অটলদার গভীর শ্রদ্ধা প্রকট হয়েছে।

ভট্টাচার্য), বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী এবং নগেন দে (মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী)। এবারেই পার্শীভক্ত খরাস্ (সন্ন্যাসের নাম কেশবানন্দ)-এর সঙ্গেও পরিচয় হয়।

বির্লা-মন্দিরে সকালে এসে একদিন দিলীপ রায় মা-কে প্রায় দু'-ঘণ্টা ধরে গেয়ে দু'খানা গান শোনালেন। তাঁর প্রথম গানটা ছিল,—

"কে তোমারে জানতে পারে (চিন্‌তে পারে)
বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত, ঘুরে মরে, অন্ধকারে।
(মা আনন্দময়ী) কে তোমারে চিন্‌তে পারে ?"
ইত্যাদি।

খুব ভাবের সঙ্গে, তন্ময় চিত্তে, মা-কে উদ্দেশ্য ক'রে ঐ গানটি গেয়ে দিলীপবাবু সকলকে মুগ্ধ ক'রেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় গান ছিল,—"বৃন্দাবনের লীলা-অভিরাম—ইত্যাদি"।

গানের পরে দিলীপবাবু মা-কে কয়েকটা প্রশ্ন করেন। তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল,—মা, আমার গুরুদেব (অর্থাৎ, শ্রীঅরবিন্দ) বলেন যে, গুরুর সাহায্য ছাড়া সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু, আমার বন্ধুরা বলেন, একটা মানুষ আবার অন্য মানুষের গুরু হবে কি ক'রে ? ঐ দু'টো কথার মধ্যে কোন্‌টা সত্যি ? মা ব'ললেন,—বাবা, দু'টো কথাই সত্যি। মায়ের উত্তর শুনে, দিলীপবাবু হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়েন। পরে, মা বুঝিয়ে বলেন,—তোমার গুরুদেব তাঁর জ্ঞান ও অনুভূতি দিয়ে যা' বুঝেছেন, তাঁর কাছে সেটাই সত্যি। আর তোমার বন্ধুরা তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে যা বলেছে,

তাদের কাছে সেটাই সত্যি। এ-সব আপেক্ষিক সত্য। তাই একটার সঙ্গে আর একটা মেলে না।

পরে দিলীপবাবু আর একটি প্রশ্ন করেন,—মা, সেদিন হাওড়া স্টেশনে আপনি আমাকে ব'লেছিলেন,—তোমাকে দেখেছি তোমার গানে। এ কথার অর্থ কি? মা উত্তর ক'রলেন,—সব শব্দের উৎপত্তি-স্থান একই। তাই, এক জায়গার শব্দ অন্য জায়গায় শোনা যায়।

বিদায়কালে, দিলীপবাবু শেষ প্রশ্ন করেন,—মা, আবার কবে আপনাকে গান শোনাব? মা উত্তর ক'রলেন,—বাবা, তুমি গেয়ো; আমি তোমার কোলে ব'সে শুনবো। মায়ের এই আশ্বাস-বাক্য যে, মায়ের উদ্দেশ্যে গান ক'রলে, মা ছোট-মেয়েটি হ'য়ে গায়কের কোলে ব'সে গান শোনেন,—আমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। এমন কি, এর পরে নিউদিল্লীতে ফিরে এসে, গায়ক হবার আশায়, মেয়েদের হারমোনিয়ম নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ছু'চার দিন 'সা-রে-গা-মা'-ও সেধেছিলাম। কিন্তু দেখলাম যে, ৪৩ বৎসর বয়সে গানের 'অ-আ-ক-খ' শিখে দিলীপ রায়ের কাছাকাছি গায়ক হওয়া শুধু দুঃসাধ্য নয়, একেবারেই অসম্ভব।

এ কয়দিনে, বির্লা-মন্দিরে আরও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও খ্যাতনামা মহিলা মা-কে দর্শন ক'রতে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার (শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ও সুবিখ্যাত দার্শনিক), বাসন্তী দেবী এবং তাঁর কন্যা অপর্ণা দেবী (পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের মা)।

একদিন ডক্টর সরকার মা-কে প্রশ্ন করেন,—মা, বিরাটের দর্শন হ'লে মানুষের শরীর থাকে, কি না? মা ব'ললেন,—সাধারণ মানুষের শরীর থাকে না। কিন্তু, এখানকার (অর্থাৎ মায়ের নিজের) কথা আলাদা। এখানে, যুগপৎ বিরাটের খেলাও চলছে, আবার তোমরা যেমন বল্‌ছো, চ'ল্‌ছো, সব কাজ ক'রছো, তা'ও চল্‌ছে।

ডক্টর সরকারের আর একটি প্রশ্ন ছিল,—মা, সাধকের কিসের অনুভূতি আগে হয়? নাদের, না বিন্দুর? মা ব'ললেন,—সংস্কার-অনুযায়ী কারও নাদের অনুভূতি (*), কারও বা বিন্দুর অনুভূতি (†) আগে হয়।

ডক্টর সরকার শেষ প্রশ্ন করেন—মা, আপনি কি ফিলাজাফি পড়েছেন? মা ব'ললেন—কেন বাবা? ডক্টর সরকার ব'ললেন,—আমরা আপনাকে যে সব প্রশ্ন করি, তার যে সব জবাব আপনি দেন, সেগুলি আমাদের ফিলাজাফির সঙ্গে মিলে যায়। এটা কি ক'রে হয়। অল্প কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পরে, মা যেন একটু বিশেষ গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন,—একটা বিরাট গ্রন্থ আছে, সব রকম জ্ঞানই তার অন্তর্গত। সেই গ্রন্থের সন্ধান যিনি পেয়েছেন, তাঁর কাছে তোমাদের দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের কিছুই অজানা থাকে না। মনে হ'ল, মা এই ইঙ্গিত ক'রলেন যে,

---

* নাদের অনুভূতি, অর্থাৎ প্রণব-শ্রবণের অনুভূতি।

† বিন্দুর অনুভূতি, অর্থাৎ জ্যোতি-দর্শনের অনুভূতি।

যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, যাবতীয় বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান তাঁর আয়ত্তের মধ্যে।

একদিন বিকালে, প্যাণ্ডালে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি ব'ললেন যে, কিছুকাল পূর্বে, তাঁর পুত্রবধূ মন্ত্রদীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়। তাঁর নিজের গুরু খুব সমর্থ পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি তখন দেহত্যাগ করেছেন। সে সময়ে মা ছিলেন নবদ্বীপে। তিনি নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর পুত্রবধূর দীক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য মা-কে অনুরোধ করেন। মা বলেছিলেন,—দীক্ষা হ'য়ে যাবে। এর কিছুদিন পরে, তিনি এলাহাবাদে তাঁর পুত্রবধূর পিত্রালয়ে যান। সেখানে, তাঁর বেয়ান ঠাকুরাণীর কাছে সংবাদ পান যে, কয়েকদিন আগে, একজন শ্বেতবসনা, এলোকেশী পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক তাঁর পুত্রবধূকে স্বপ্নে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন। ঠাকুরঘরে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ মন্ত্র জপ ক'রে বধূটি বেহুঁস হ'য়ে যান। তিনি বুঝেছিলেন যে, মা-ই তাঁর পুত্রবধূকে দীক্ষা দিয়েছেন। বধূটি মা-কে দেখতে চা'ন ব'লে মা-কে দর্শন করাতে তাঁকে সঙ্গে এনেছেন। এর পরে, মা প্যাণ্ডালে এলে, বধূটি দূর থেকে মা-কে প্রণাম ক'রে একদৃষ্টিতে মায়ের দিকে চেয়ে ব'সেছিলেন। ঐ গৌরবর্ণা তরুণী বধূটির বিস্ময়বিস্ফারিত অশ্রুসজল ডাগর চোখ দুটি আমার আজও (উনচল্লিশ বৎসর পরে) বেশ মনে আছে।

একদিন গভীর রাত্রে ১২টার পরে, যতীশদা'দের হল-ঘরে

যতীশদা'র ছোট মেয়ে বুনি (*) ফুলের মালা, ফুলের নানাবিধ গয়না এবং শিখী-পাখা-যুক্ত ফুলের মুকুট দিয়ে মা-কে কৃষ্ণ সাজিয়েছিল। সেই রাত্রে, বেশ কিছু সময়ের জন্য, মা তাঁর ছেলেদের সব হল-ঘর থেকে বা'র ক'রে দিয়ে, শুধু মেয়েদের নিয়ে কীর্তন এবং নানারূপ (আমাদের অজ্ঞাত) লীলা করেন। পরে, যখন মায়ের নির্দেশে আমরা হল-ঘরে আবার প্রবেশ ক'রলাম, তখন দেখলাম, মায়ের হাতে একটা বাঁশীও দেওয়া হ'য়েছে। বেশ বুঝা যাচ্ছিল, মা যেন কিছুটা কৃষ্ণের আবেশে অভিভূত হ'য়েছেন। আর আমিও যেন চলন্ত, জীবন্ত এক পূর্ণাঙ্গ কৃষ্ণ-দর্শনে ধন্য হ'লাম। তখন আমি মনে মনে ছবির-মাকে বলেছিলাম,—তুমি হতভাগিনী, মায়ের আজকার দেব-দুর্লভ কৃষ্ণরূপ দেখতে পেলে না।

পরে, খানিকটা প্রকৃতিস্থ হ'য়ে, ঐ বেশেই হল-ঘরের এক জায়গায় মা দাঁড়ালেন। তখন ভক্তরা সব একে একে এসে—নিশ্চয়ই কৃষ্ণ-জ্ঞানে—মায়ের ঐ কৃষ্ণ-মূর্তির সামনে প্রণাম ক'রতে লাগলেন। যখন আমার প্রণাম করার পালা এল

---

* বুনির ভাল নাম ছিল 'যূথিকা'। সদা হাস্যময়ী এই কুমারীর মা নাম দিয়েছিলেন—'ফুল্লযূথিকা'। মায়ের প্রতি এর ছিল গভীর ভালবাসা ও অনন্যা ভক্তি। বহু বৎসর মায়ের সঙ্গে থেকে মা-কে যে আন্তরিক সেবা-যত্ন সে ক'রেছে, তার তুলনা বিরল। মায়ের উপস্থিতিতে, বৃন্দাবনে এই মহীয়সী কুমারী দেহত্যাগ করে ১৯৬৪ সালে, দুর্গাপূজার পরে, নভেম্বরের গোড়ার দিকে। ঐ দিনের সাতদিন মাত্র আগে, আমি যখন তা'কে বৃন্দাবন-আশ্রমে শেষবার দেখি, তখন সে খুবই অসুস্থ। তার একমাত্র দুঃখ ছিল যে, সে তখন সক্রিয়ভাবে মায়ের সেবা ক'রতে পারছিল না।

—আমার বিহ্বলতা তখনও সম্পূর্ণ কাটেনি—আমি মায়ের সামনে হাঁটু-গেড়ে ব'সে নিবেদন ক'রলাম,—মা, আজ আমরা তোমাকে বিশেষভাবে প্রণাম ক'রছি। আজ আমি প্রণাম করছি দুটি সর্তে। মা জিজ্ঞাসা করলেন,—কি তোমার সর্ত? আমি ব'ললাম—প্রথমতঃ, কেউ যখন তোমাকে প্রণাম করে, তুমি হাত-দুটি জোড় ক'রে প্রতি-নমস্কার কর। আজ আর তুমি হাত-জোড় ক'রবে না। দ্বিতীয়তঃ, কেউ যখন প্রণাম করে, তুমি তার দিকে আড়-চোখে দেখ। আজ আমি প্রণাম করার পরে, তোমাকে আমার দিকে সোজাসুজি তাকাতে হ'বে। মা ব'ললেন,—আচ্ছা। প্রতিশ্রুতি পেয়ে, আমি মায়ের চরণযুগলে মাথা রেখে প্রাণ ভ'রে প্রণাম ক'রলাম। লক্ষ্য ক'রলাম যে, মা হাত-জোড় না ক'রে আমার প্রথম সর্ত পূর্ণ ক'রলেন। তারপরে দ্বিতীয় সর্ত-অনুযায়ী মা আমার দিকে তাকাবেন মনে ক'রে, আমি মায়ের দিকে তাকালাম। লীলাময়ী কিন্তু দ্বিতীয় সর্তটি সহজে পূর্ণ ক'রলেন না। তিনি অন্যদিকে চেয়ে রইলেন। আমি সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার যেই মায়ের দিকে তাকালাম, অমনি মা মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি ক'রতে লাগলেন। এইভাবে, কয়েকবার আমাকে হতাশ ক'রে, আমার মধ্যে তাঁর কৃপা-দৃষ্টি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যখন খুব প্রবল হ'ল, তখন প্রতিশ্রুতি-মতো আমার দিকে সোজাসুজি দৃষ্টিপাত ক'রলেন। মনে হ'ল, ঐ স্নিগ্ধ-মধুর প্রশান্ত দৃষ্টি দিয়ে মা যেন সূক্ষ্মভাবে আমার সর্ব-শরীরে পরিব্যাপ্ত হ'লেন। আমার সে সময়ের শান্ত আনন্দের

অনুভূতি বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই। আরও কত কত বার লালায়িত হয়েছি ঐ কৃপাদৃষ্টির দিব্য আনন্দ পুনরায় পাওয়ার জন্য। কিন্তু ঐ অপ্রাকৃত আনন্দ-পাওয়া তো আমার ইচ্ছাধীন নয়,—সম্পূর্ণ মায়ের কৃপাসাপেক্ষ।

সেই সময়ে দেখলাম, প্রণাম করার পরে অনেক ভক্ত সময় ঠিক ক'রে নিচ্ছেন, মায়ের সাথে গোপনে নিজ নিজ সমস্যা সমাধানের (ভক্তদের প্রচলিত ভাষায়, প্রাইভেট করার) জন্য। অন্যদের দেখাদেখি, আমিও মা-কে প্রশ্ন ক'রলাম,—মা, আমাকে একটু সময় দেবে? আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, মা ব'ললেন,—তুমি সময় নেবে কেন? তোমার তো কোনও প্রশ্ন নেই। আমিও মনে মনে ভেবে দেখলাম যে,—সত্যিই আমার কোনও প্রশ্ন নেই। তাই, চুপ ক'রে রইলাম। তবুও মা ব'ললেন,—তোমার মনে যদি কখনও কোনোও প্রশ্ন আসে, মনে-মনে প্রশ্ন ক'রো, জবাব পাবে। তাই, মায়ের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ক'রে, আমি চিরদিনের জন্য একেবারে নিশ্চিন্ত। কোনোও প্রশ্ন এলে, মনে-মনেই মা-কে বার বার জানাতে থাকি, এবং উত্তরও পেয়ে যাই।

ঐ রাত্রেই মায়ের সঙ্গেই বির্লামন্দিরের নাটমন্দিরে এসেছিলাম, মায়ের কাছাকাছি শুয়ে, বাকি রাতটুকু কাটাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আমরা (আমি ও আমার ভাই বীরেন) যখন মন্দিরে এসেছি, তখন রাত তিন্‌টে। দেখলাম, মা তাঁর ছেলে-মেয়ে সকলের জন্যই শোবার জায়গা নির্দেশ করছেন।

মায়ের শয্যা পাতা ছিল নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে। তার একদিকে মেয়েদের, অপরদিকে ছেলেদের জায়গা ঠিক করা হ'চ্ছিল। আমি ব'ললাম,—মা, আমার জন্য তো শোবার জায়গা একটা ঠিক ক'রে দিলে না? মা প্রশ্ন ক'রলেন,—তুমি কাল কোথায় শুয়েছিলে? আমি ব'ললাম,—মা, কাল রাত্রে কোনোও জায়গা না পেয়ে, বাইরে খোলা রকে শুয়েছিলাম। মা তখনই আমার জন্য একটা জায়গা নির্দেশ ক'রে দিলেন। কিন্তু সেই জায়গায় শুতে গিয়ে আমি বেশ মুস্কিলে প'ড়লাম। আমি এমনভাবে শুলাম, যা'তে আমার মাথা মায়ের দিকে ও ভোলানাথের দিকে থাকে। কিন্তু ঐ ভাবে শোয়ায় আমার পা-তু'টো লম্বা হ'ল মন্দিরের শিব-ঠাকুরের দিকে। ক্ষীণ আলোয় আমি লক্ষ্য ক'রলাম যে, মা শুয়ে আছেন আমার দিকে পিছন ক'রে। সুতরাং, আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, আমার পা' তুটো যে মন্দিরের ঠাকুরের দিকে লম্বা হয়েছে, মা তা' দেখতে পান নি। কিন্তু, আমার ভুল বুঝলাম তখন, যখন —আমার দিকে পিছন ক'রেই—মা হঠাৎ ব'ললেন,—আমার ঠাকুরের দিকে পা' ক'রো না। ঐ নিষেধ-বাণী যখন মা তিন-তিন বার উচ্চারণ ক'রলেন, তখন আমার মুখ দিয়ে উত্তর বেরুল,—আমার ঠাকুরের দিকে (অর্থাৎ, আমার নূতন ইষ্ট মায়ের দিকে) আমার মাথা আছে। এর পরেও মা যখন ঐ একই নিষেধ-বাণী আরও তিনবার উচ্চারণ ক'রলেন, তখন আমার জবাব বেরুল,—আচ্ছা, আমার ঠাকুর (অর্থাৎ, তুমিই যে আমার ইষ্ট এই সত্যটা) যদি তুমি মানো, আমিও তোমার

ঠাকুর মানবো। অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, মা ব'ললেন,—আচ্ছা, তোমার ঠাকুর আমি মানছি। সঙ্গে সঙ্গে, আমারও উত্তর বেরুল,—আচ্ছা, তোমার ঠাকুরও আমি মানছি, আমি কোনাকুনি লম্বা হ'য়ে শুচ্ছি। মা ব'ললেন,—আচ্ছা বাবা, তাই শোও। এই অপ্রত্যাশিত লীলার মাধ্যমে, আমি যে গোপালের জায়গায় মা-কেই ইষ্ট ব'লে গ্রহণ ক'রেছি, এই পরিবর্তন মা সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করলেন।

পরের দিন (১০ই মে ১৯৩৭), যখন আমার ক'লকাতার বাসায় ফিরি, তখন, উপরি-উপরি কয় রাত্রি জেগে (শুতে রোজই রাত্রি ২টা-৩টা হ'ত), শরীর খুবই ক্লান্ত। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে। চ'লতে, দাঁড়াতে পারছিনা—ঢুলে' প'ড়ে যাচ্ছি। মনে হ'ল—ঐ সময়ে একদিন ভাইজী ব'লেছিলেন,—মায়ের সঙ্গ ক'রতে হ'লে গুড়াকেশ (নিদ্রাজয়ী) হ'তে হ'বে। ঐ দিন, মায়ের শিয়ালদা স্টেশন থেকে ফরিদপুরের দিকে রওনা হওয়ার কথা ছিল। দু'-তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে, আহারাদি সেরে, শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছুলাম বেলা ২টার কাছাকাছি। মা-কে বিদায় প্রণাম জানাতে বহু পুরুষ ও স্ত্রী ভক্ত স্টেশনে এসেছিলেন। মায়ের সঙ্গে যাচ্ছিলেন—ভোলানাথ, ভাইজী, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও গুরুপ্রিয়া দিদি। শ্রীঅবনী শর্মা (বহরমপুরের পুরানো ভক্ত) ও একজন মুসলমান ভক্তকে স্টেশনে দেখেছিলাম, বেশ মনে আছে। পোশাক ও মাথার জরিদার তাজ দেখে মুসলমান ভক্ত যে বোম্বেওয়ালা সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী, তা' বুঝা যাচ্ছিল।

ট্রেণে ব'সে মা একটা ডাবের জল কতকটা খেয়ে মুসলমান ভক্তটিকে প্রসাদ দিলেন। তিনিও প্ল্যাট্‌ফর্মের উপরে বেঞ্চে ব'সে প্রসাদী ডাবের বাকি জলটুকু খেয়ে ফেললেন।

ঐ ট্রেণটার শিয়ালদা' থেকে ছেড়ে প্রথম থামবার কথা ছিল বারাসতে। আমি বারাসতের একখানা টিকিট কিনে, মায়ের সঙ্গে কিছুদূর যাওয়ার উদ্দেশ্যে মায়ের কামরাতে উঠেছিলাম। বারাসতে নামতেই, গুরুপ্রিয়া দিদি একটা প্রকাণ্ড পিতলের ঘটি—যা'কে ঘড়া বলা চলে—আমার হাতে দিলেন, পানীয় জল আনার জন্য। কতকটা দৌড়াদৌড়ি ক'রে যখন জলপূর্ণ ঘটিটা এনে গুরুপ্রিয়া দিদির হাতে দিলাম, তখন ট্রেণটা চলতে আরম্ভ ক'রেছে।

* * * *

১৯৩৭ সালের মে মাসে যখন ক'লকাতা থেকে ট্রেণে দিল্লী ফিরছিলাম, তখন রাত্রে বাঙ্কের উপর বিছানা পেতে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলাম। গভীর রাত্রে ঘুম-ভাঙ্গার পরে, ব'সে ব'সে উন্মনা হ'য়ে মায়ের কথাই চিন্তা করছিলাম। সেই সময়ে আমার মায়ের সম্বন্ধে একটা গান রচনা করার প্রেরণা আসে। আমার মেয়ে 'মণি' রামপ্রসাদী সুরের একটা ভারি মিষ্টি গান ক'রতো। সেই গানের ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ট্রেণের বাঙ্কের উপর ব'সে যে গানটা রচনা ক'রেছিলেম, নীচে দিলাম।

এসেছে আনন্দময়ী

(রামপ্রসাদী সুরের গান)

এসেছে আনন্দময়ী, এসেছে আনন্দময়ী ॥
সে যে অন্নপূর্ণা বীণাপাণি রাধারাণী ভাবময়ী।
কত জন্ম জন্ম ধরি
মা-কে খুঁজে খুঁজে মরি,
সব খোঁজা আজ সফল হ'ল, দেখে মা-কে রূপময়ী।
মনের ব্যথা সব ভুলেছি, পেয়েছি আনন্দময়ী।
ধন্য ভুবন ধন্য জীবন,
সত্য হ'ল পুণ্য স্বপন,
আলো ক'রে যাত্রাপথ এসেছে মা দীপ্তিময়ী।
তাই দৃপ্ত শিশু চ'ল্‌বে এবার জীবন-পথে মৃত্যুজয়ী।
শূন্যে শুনি 'মা' 'মা' রব,
বাতাস আনে কি সৌরভ,
বিভোর হ'ল মুগ্ধ হৃদয়, পেয়েছি আনন্দময়ী।
মোর সাধনা, মোর সিদ্ধি, সত্যরূপা চিন্ময়ী।

—০—

চতুর্থ অধ্যায়

বেরিলি-নৈনিতাল-আলমোড়ায় সাত দিন

(৬ই—১২ই জুন, ১৯৩৭)

নিউ দিল্লী থেকে ক'লকাতায় টেলিগ্রাম ক'রে আমরা জেনেছিলাম যে, কৈলাস যাত্রার পথে, মা সদলে বেরিলি পৌঁছুবেন ৫ই জুন (১৯৩৭)। আমরা বেরিলি থেকে আল-মোড়া পর্যন্ত কয়েকটা দিন মায়ের সঙ্গে থেকে, কৈলাসের রাস্তায় মা-কে পৌঁছুতে যাব কিনা,—কয় দিন ধ'রে এই নিয়ে আমাদের জল্পনা চ'লছিল। যাওয়ার প্রধান অন্তরায় ছিল— সাংসারিক দায়িত্ববোধ। ৫ই জুন তারিখেই, টেলিগ্রামে মায়ের বেরিলি পৌঁছানোর কথা জেনে, আমরা বেরিলিতে মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। বাড়ী থেকে বেরুবার আগে,—আমাদের ঠাকুরঘরের চৌকির উপর মায়ের বাঁধানো ফটো রাখা ছিল,—সেই ফটোর সামনে প্রণাম ক'রে প্রার্থনা জানালাম,—মা, তোমার শরীর দর্শন করার জন্য আমরা বড়ই উতলা হ'য়েছি,—আমরা বাড়ীতে থাক্‌তে পারছি না—আমরা বেরিলি চল্‌লাম। তুমি তো এখানে রইলে। আমাদের অনুপস্থিতিতে, তুমিই আমাদের ছেলেমেয়েদের দেখো। ঐ ভাবে প্রার্থনা জানিয়ে, ছবির-মা ও আমি নিশ্চিন্ত মনে বেরিলি রওনা হ'লাম, এবং বেরিলি পৌঁছুলাম ৬ই জুন (১৯৩৭) রবিবারে সকালে।

ঐ রাত্রে আমরা সব শুয়েছিলাম ধর্মশালায় একটা খোলা ছাদে। রাত্রিটা ছিল গুমট্ গরম। মা-কে প্রায় সারা রাত্রি হাত-পাখার হাওয়া করতে হয়েছিল। প্রথমে হাওয়া ক'রছিলেন গুরুপ্রিয়া দিদি (*)। কিন্তু, তিনি পরিশ্রান্ত থাক্‌তেন, এবং হাওয়া ক'রতে ব'সে প্রায়ই ঝিমাতেন, এবং ঘুমের ঘোরে মায়ের গায়েই পাখা ঠুক্‌তেন। তা' দেখে, আমিই দিদির হাত থেকে পাখা নিয়ে মা-কে হাওয়া ক'রতে লাগলাম। কিন্তু, দেখে লজ্জিত হ'লাম যে, খানিক বাদে, আমিও নিদ্রালু হ'য়ে মায়ের গায়ে পাখা ঠুক্‌ছি। শেষে, ছবির-মায়ের হাতে পাখা দিয়ে আমি শুয়ে প'ড়লাম। ছবির-মা খুব রাত্রি-জাগ্‌তে পারতেন। তাই, আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, সে রাত্রে আর মা-কে হাওয়ার সঙ্গে পাখার ঠুকুনি খেতে হয়নি।

৭ই জুন্ (সোমবার) আমাদের সারা দিন বেরিলির ধর্মশালায় কাট্‌লো। ঐ দিন, ছবির-মা ও আমি, মায়ের উপস্থিতিতে, ভোলানাথের কাছে মন্ত্রদীক্ষা পাই। দীক্ষাদানের পূর্বে, ভোলানাথ যখন পূজা করেন, এবং পরে যখন দীক্ষা দেন, সমস্ত সময়, মা আমাদের সাম্‌নে একটি আসনের উপরে, কাপড় মুড়ি দিয়ে, নিশ্চলভাবে শুয়েছিলেন। আমাদের মনে হয়েছিল যে, ভোলানাথ মা-কেই পূজা ক'রেছিলেন, এবং আমাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন, সম্পূর্ণভাবে মায়ের নির্দেশে।

ঐ দিন বিকালে আমরা সকলেই, মায়ের সঙ্গে বেরিলির

---

* ৮ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বাজারে গিয়েছিলাম। সেখানে মায়ের জন্য একজোড়া চটি জুতা কেনার অভিপ্রায়ে একটা জুতার দোকানে ঢুকেছিলাম। মায়ের পায়ের মাপের একজোড়া চটি জুতা পছন্দও করা হ'ল। মুসলমান দোকানীকে মা ব'লেছিলেন,—তুমি এই চটি-জোড়া আমাকে দাও, দাম নিও না, তা' হ'লে তোমার কল্যাণ হবে। দোকানী কিন্তু রাজী হয় নি। এই চটি-জোড়া কিনে নিয়ে যখন ধর্মশালায় ফিরছিলাম, পথে মা ব'লেছিলেন,—দোকানী যদি দাম না-নিয়ে চটি-জোড়া আমাকে দিত, ওর খুব ভালো হ'ত। কিন্তু ওর অদৃষ্ট খারাপ, তাই দিতে রাজী হ'ল না (*)।

ঐ সোমবারেই মধ্যরাত্রে বেরিলি ত্যাগ ক'রে আমরা মায়ের দলের সঙ্গে ট্রেণে কাঠগুদাম পৌঁছাই পরদিন (৮।৬।৩৭) মঙ্গলবারে সকালে। লক্ষ্ণৌ-এর মানিক ও বেরিলির মিসেস্ যশপাল (মা এঁর নাম দিয়েছেন 'মহারতন'—মায়ের প্রতি এঁর আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম) আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। কাঠগুদাম থেকে বাসে চ'ড়ে আমরা ২০।২২ জন (বাঙালী, উত্তর-প্রদেশীয়, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী—স্ত্রী-পুরুষ সব মিলিয়ে), নৈনিতালে, 'তাল্লি-তালাও'—নামক বিখ্যাত হ্রদের (lake-এর) এক প্রান্তে পৌঁছে, বাস্ থেকে নামলাম। লেক্টা এক মাইল্ লম্বা ও আধ মাইল্ চওড়া। এই লেক্ আমরা প্রায় লম্বালম্বি ভাবে পার হ'য়ে নয়নাদেবীর মন্দির-সংলগ্ন ধর্মশালায় যাবো কয়েকটা সাম্পান্-জাতীয় ছোট ছোট নৌকায়।

---

* পরে জানা গিয়েছিল—ঐ দোকানী ঐ ঘটনার এক মাসের মধ্যেই মারা গিয়েছিল।

প্রত্যেক নৌকায় ছিল মাত্র একজন মাঝি। দু'-তিন স্ত্রী-ভক্ত সঙ্গে নিয়ে, যে নৌকায় মা উঠেছিলেন, আমাদের নৌকা—যা'তে ভোলানাথের সঙ্গে টুনু (যতীশদা'র শ্যালক) ও আমি ছিলাম—ছিল তা'র পিছনেই, বোধ হয় কুড়ি হাত দূরে। টুনু ও আমি দু'জনেই ছিলাম ভোলানাথের মন্ত্র-শিষ্য। আমাদের খেয়াল হ'ল—যেমন ক'রে হোক্ ভোলানাথের নৌকাকে মায়ের নৌকার আগে ক'রে দেবো। টুনু ও আমি দুখানা ছোট দাঁড় নিয়ে, আমাদের মাঝিকে প্রাণপণে সাহায্য ক'রতে লাগ্‌লাম। শিশু-স্বভাব ভোলানাথও, আমাদের উদ্দেশ্য যা'তে সফল হয়, তা'তে খুব উৎসাহ দিচ্ছিলেন। প্রায় ১০ মিনিট কাল দাঁড় চালিয়ে, মায়ের নৌকা ও আমাদের নৌকার মধ্যকার দূরত্ব একটুও কমাতে পারা গেল না। মা-ও হাসিমুখে আমাদের নিষ্ফল অধ্যবসায় লক্ষ্য ক'রছিলেন। আমরা যখন হতাশ হ'য়ে রণে ভঙ্গ দিলাম, তখন আমাদের অবস্থা দেখে, মা এবং তাঁর সঙ্গী স্ত্রী-ভক্তরা খুব হাসছিলেন। এক্ষেত্রে আর একবার বুঝলাম, মা-কে কোনও কিছুতেই হারানো যায় না। সর্ব ক্ষেত্রেই তিনি অপরাজেয়া।

প্রায় সব মানুষই মনে করে যে, তার নিজের বুদ্ধি খুব প্রখর। আমিও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না। সোমবার (৭।৬।৩৭) রাত্রেই নৈনিতালে নয়নাদেবীর মন্দির-সংলগ্ন ধর্ম-শালার একটা ঘরে, মা আমাকে একটা কাজ দিলেন। কতক-গুলি কাপড়-চোপড় ও টুকি-টাকি অনেক জিনিস—মা আদেশ ক'রলেন আমাকে—একটা মাঝারি-সাইজের খালি ট্রাঙ্কে

গুছিয়ে রাখ্‌তে। আমি নানা ভাবে জিনিসগুলি সাজিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'রে দেখি, সব জিনিসগুলি ঐ ট্রাঙ্কে কোনও মতেই ধরানো যাচ্ছে না। নিরুপায় হ'য়ে আমি তখন মনে-মনে গাণিতিক হিসাব ক'রতে লাগলাম। প্রথমে ট্রাঙ্কটার আয়তন আন্দাজ ক'রে বুঝলাম যে, এই ট্রাঙ্কে এতো ঘন-ইঞ্চি পরিমাণ জিনিস ধ'রতে পারে। তারপরে জিনিসগুলির আয়তন এক এক ক'রে আন্দাজে ঠিক্ ক'রে তাদের মিলিত আয়তন কত ঘন-ইঞ্চি হ'তে পারে, তা'ও ঠিক ক'রলাম। দেখলাম, জিনিসগুলির মোট আয়তন ট্রাঙ্কের ভিতরকার আয়তনের চেয়ে নিঃসন্দেহে বেশী। এই বুঝে, মা-কে একটু জোর গলায় জানালাম যে, এতো সব জিনিস এই ট্রাঙ্কে ধরানো যাবে না। মা ব'ললেন,—আচ্ছা, আমাকে দাও, আমি দেখি, সব জিনিসগুলি ঐ ট্রাঙ্কে ধরানো যায় কিনা। তখনই মা, নিপুণ-ক্ষিপ্র-হস্তে, নিখুঁত ভাবে জিনিসগুলি একে একে ঐ ট্রাঙ্কে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন। আমি দেখে অবাক্ হ'লাম যে, প্রথম চেষ্টাতেই জিনিসগুলি সব সহজেই ট্রাঙ্কে ধ'রে গেল। ট্রাঙ্কের ঢাক্‌নিটাও অক্লেশে বন্ধ করা গেল। আমার শিক্ষার ও বুদ্ধির অহংকার—এই তুচ্ছ ঘটনায় একটা বড় রকমের ধাক্‌কা খেয়েছিল। বুঝলাম যে, সাংসারিক কর্ম-কুশলতায় মা সকলের উপরে। আমাদের চেষ্টায় ও বিচার-বুদ্ধিতে যে কাজ অসম্ভব দেখি, মায়ের কাছে তা' শুধু সম্ভব নয়, অনায়াস-সাধ্য।

পরের দিন (৮।৬।৩৭) বিকালে—তখনও গাছের মাথায়

রোদ্দুর চিক্ চিক্ ক'রছিল—মা হঠাৎ ব'ললেন,—চল সকলে লেকের ধারে একটু বেড়িয়ে আসি। মেয়েরা—যাঁরা রাত্রের খাওয়ার জন্য রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন—একটু আপত্তি জানালেন, মা কিন্তু তাঁদেরও ছাড়লেন না। ব'ল্লেন—উনানের আঁচ ক'মিয়ে, পাকশালা বন্ধ ক'রে সব বেরিয়ে পড়, রান্না আপনি হ'য়ে থাক্‌বে। আমাদের সমগ্র দল মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে, লেকের ধারের পিচের রাস্তা ধ'রে এগিয়ে চল্‌লো। রাস্তার ধারে অনেক বড় বড় গাছ ও মাঝে মাঝে কাঠের হেলান্-দেওয়া বেঞ্চি পাতা ছিল। অনেক দূর যাওয়ার পরে মা ব'ল্লেন,—এইবার ফেরা যাক্। এই ব'লে মন্দিরের দিকে কিছু দূর ফিরে এলেন। পরে, একটা বেঞ্চির উপর কিছুক্ষণ ব'সলেন। মায়ের কিছুটা চঞ্চল গতি ও চাহনি দেখে, বেশ বুঝা যাচ্ছিল,—মা যেন কি খুঁজছেন। মেয়েরা কেউ কেউ মায়ের সঙ্গে বেঞ্চিতে ব'সেছিলেন। আমরা অপর সকলে মা-কে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ মা উঠে দাঁড়িয়ে আবার ব'ল্লেন,—এইবার ফেরা যাক্। আমাদের আশ্রয়স্থল মন্দিরের দিকে আমরা কয়েক পা' অগ্রসর হ'তেই, একটা চড়ুই পাখী—সন্নিহিত গাছের উপর থেকে—মায়ের পায়ের কাছে প'ড়ে ছট্‌ফট্ ক'রতে লাগ্‌লো। কাছেই একটি কাশ্মীরী কিশোর দাঁড়িয়েছিল। মা তা'কে ব'ল্লেন,—ইস্‌কো উঠাও তো। সে-ও সাবধানে পাখীটাকে হাতে ক'রে তুলে, মায়ের চোখের কাছে ধ'রলো। আমি কাছেই ছিলাম। ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক বোধ হওয়ায় আমি খুব মনোযোগ দিয়ে

সব দেখ্‌ছিলাম। বেশ লক্ষ্য ক'রলাম, পাখীটা তার ক্ষুদ্র চোখ দিয়ে মায়ের মুখের দিকে দেখ্‌ছিল। আর মা-ও তার দিকে সস্নেহে দেখ্‌তে লাগলেন। পাখীটার ডানা ছু'টো কাঁপছিল। একটু পরে ডানা-কাঁপা ক্রমশঃ ক'মে গিয়ে, পাখীটা সম্পূর্ণ স্থির হ'য়ে গেল। তার চোখও বুজে গেল। বুঝা গেল যে, পাখীটার দেহ প্রাণশূন্য হ'য়েছে। মা কাশ্মীরী কিশোরটিকে আদেশ ক'রলেন,—ইস্‌কো ফেক্‌ দেও। সে সন্তর্পণে লেকের ধারে পাখীর মর-দেহটা রেখে দিয়ে মায়ের আদেশ পালন ক'রলো। ঐ রাত্রেই আহারাদি সেরে শোবার আগে, মায়ের চারিদিকে নিজ নিজ শয্যা পেতে, শয্যায় বসে আমরা সবাই মায়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রছিলাম। চড়ুই-পাখীটার প্রসঙ্গে, মা-কে প্রশ্ন করা হয়,—পাখীটা কে? কেন মৃত্যুর আগে সে মায়ের দিকে অমন ক'রে চেয়েছিল, আর মা'-ই বা কেন অমন ক'রে তার দিকে চেয়ে দেখছিলেন? উত্তরে, মা শুধু তিনটে শব্দ উচ্চারণ ক'রলেন,—'দর্শন প্রার্থী ছিল'। এই ছোট্ট উত্তরের ভিতর আমার একটা দুরূহ প্রশ্নের সমাধান পেলাম। মায়ের নির্দেশ-মতো (৩৬ পৃষ্ঠা) আমি ঐ সময়ে দিনের পর দিন মনে-মনে মা-কে প্রশ্ন ক'রছিলাম,—মা, তুমি তো আপ্তকাম। তোমার জান্‌বার, শোনবার, দেখবার, শেখবার, পাওয়ার তো কিছুই নেই। তবুও কেন তুমি এতো কষ্ট ক'রে ট্রেণে থার্ড ক্লাসে ভ্রমণ ক'রে, দেশ-বিদেশে যত্রতত্র এতো ঘোরাঘুরি কর? ঐ সংক্ষিপ্ত উত্তরটুকু আমাকে বুঝিয়ে দিল যে, প্রশান্তচিত্ত আমাদের

আনন্দময়ী মা এতো ঘুরাঘুরি করেন—কোথায় কোথায় মুমূর্ষু কত শত শত ভক্ত—মনুষ্য, পশু, পাখী বা বৃক্ষরূপে—আকুল ভাবে মায়ের দর্শন প্রার্থনা ক'রছে—তাদের প্রত্যেককে দর্শন দিয়ে, জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে চিরমুক্তি দিয়ে ধন্য ক'রতে। শুধু এই দর্শন দেওয়ার চেষ্টাতেই এতো সব ঘোরাঘুরি।

ঐ রাত্রেই মা, তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসার একটা মনোজ্ঞ স্বীকৃতি দিলেন। মা ব'ললেন,—তোমরা যারা অবস্থা সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও, এই শরীরের সঙ্গে কষ্ট ক'রে থার্ড ক্লাসে ভ্রমণ ক'রছ, ধর্মশালায়, মন্দিরে, নানা অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছ,—এ সব ক'রছ, শুধু এই শরীরটাকে ভালবাসো ব'লেই তো। তাঁকে যে আমরা খুবই ভালবাসি—এ কথা তাঁর মুখে শুনে আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল।

পরদিন বুধবারে (৯।৬।৩৭) দুপুরে প্রায় ১২টা লাগাৎ মায়ের সঙ্গে আমরা সব নয়নাদেবী-মন্দিরের ধর্মশালা ত্যাগ ক'রে, কয়েকখানা ছোট নৌকা ক'রে লেক্ অতিক্রম ক'রে বাস্-ষ্ট্যাণ্ডে যাবার চেষ্টা করলাম। ঐ সময়ে বাতাসের প্রচণ্ড বেগ হওয়ায়, সুগভীর লেক্-এর নীল জলের উপরে বড় বড় ঢেউ উঠতে লাগ্‌লো। তখন নৌকায় যাওয়া সঙ্কটাপন্ন মনে হ'ল। তাই, নৌকাগুলি কিনারায় লাগিয়ে মাঝ-পথে নেমে, লেক্-এর ধারের পিচের রাস্তা ধ'রে আমরা সব হেঁটেই বাস্-ষ্ট্যাণ্ডে চলে গেলাম। সেখানে আমরা সকলেই আল্‌মোড়া-গামী একটা বাসে চ'ড়লাম। প্রায় সন্ধ্যায়

আমাদের বাস্ পৌঁছাল রাণীক্ষেতে। এই সব পাহাড়ী অঞ্চলের অতি-ঢালু, আঁকা-বাঁকা রাস্তায় সন্ধ্যার পরে বাস্-চলাচল নিষিদ্ধ। তা'ই রাণীক্ষেতেই আমাদের রাত্রি কাটাতে হ'ল। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা (তাঁদের মধ্যে আমাদের সঙ্গী মায়ের ভক্তদের চেনা-জানাও ছিলেন) একটা স্কুলবাড়ীতে আমাদের রাত্রে থাকার ও খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। মা সঙ্গে থাক্লে যে কোনও জায়গায় চলা, থাকা ও খাওয়া সবই যে নির্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তা' বুঝা গেল। পরদিন বৃহস্পতিবারে (১০।৬।৩৭) চিনি-দেওয়া গরুর দুধ সহ প্রাতঃরাশ সেরে, আমরা আবার বাসে উঠে আল্মোড়ার দিকে রওনা হ'লাম সকাল সাতটায়। পথে, রাণীক্ষেত বাজারে কাশীর দাশু-দা'র সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হ'ল। ইনি কেদার, বদরী প্রভৃতি তীর্থ-পর্যটন শেষ ক'রে কাশী ফিরছিলেন। এখন, মা সদলে কৈলাস-যাত্রা ক'রবেন শুনে, ইনিও মায়ের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দাশু-দা' বেশ সুস্থ-সবল ও করিৎকর্মা লোক ছিলেন এবং মায়ের দলের প্রায় সকলেরই পূর্ব-পরিচিত। সকলেই হৃষ্টচিত্তে দাশু-দা'কে সঙ্গে নিলেন।

ঐ দিন মায়ের সঙ্গে বাসে যেতে যেতে মায়ের কৃপায় আমার এক অভূতপূর্ব দিব্যদর্শন বা অনুভূতি হয়। বাসে মা ও মেয়েরা সাম্নের দু'-তিনটা বেঞ্চি দখল ক'রেছিলেন। আমরা (মায়ের ছেলেরা) সব পিছনে ছিলাম। হরিরাম যোশী (উত্তরপ্রদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও মায়ের

একান্ত ভক্ত) *, দাশু-দা', মানিক, টুনু ও আমি পিছন দিকে বাসের মেঝেতে ব'সে উচ্চৈঃস্বরে 'মা-মা-মা-মা' কীর্তন ক'রছিলাম। কীর্তন যখন খুব জমে' এসেছে, তখন আমার চোখ দিয়ে জল প'ড়ছিল। আমি কল্পনা ক'রছিলাম যে—মা ছোট্ট একটি মেয়ে হ'য়ে আমার ডা'ন কোলে ব'সে কীর্তন শুনছেন—ক'লকাতায় বিড়লা-মন্দিরে দিলীপ রায়কে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (৩১ পৃষ্ঠা)। হঠাৎ বিস্মিত হ'লাম দেখে যে, আমার কল্পিত মায়ের ছোট্ট মেয়ের মূর্তি ব'দলে গিয়েছে। স্পষ্ট দেখলাম, তার জায়গায়, আমার ডা'ন কোলে দু'টো ছোট ছোট পা' রেখে, এক নীলবর্ণ অতি-সুন্দর শিশু-কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে। দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে' যেন ব'লছেন,—কেঁদো না। এই দেখে, আমি বিহ্বল হ'য়ে আরও ফুঁপিয়ে কাঁদলাম। অল্পক্ষণে, ঐ দৃশ্য শূন্যে মিলিয়ে গেল। এই ক্ষণস্থায়ী দর্শনেও আবার একবার আমার দৃঢ়প্রত্যয় হ'ল যে,—মা ও কৃষ্ণ অভেদ।

সকালেই ১১টা লাগাৎ আলমোড়ায় পৌঁছে, মায়ের সঙ্গে আমরা সকলেই আশ্রয় নিলাম—প্রসিদ্ধ নন্দাদেবীর সুবৃহৎ মন্দিরে। ঐ মন্দিরে মায়ের সঙ্গে আমরা তিন দিন ছিলাম। অবিস্মরণীয় ঐ তিনটি দিনের অনেক স্মৃতি রোমন্থন ক'রে আজও আমি যে অমৃতের আস্বাদ পাই, তা লেখনী-মুখে প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই।

---

* ইনি পরে MA ANANDAMAYI LILA নামে পুস্তক লিখেছেন ইংরাজীতে। ইনি আলমোড়ার অধিবাসী ছিলেন। ইনি এখন পরলোকে।

প্রতিরাত্রেই, খাওয়া-দাওয়ার পরে, মায়ের নির্দেশিত স্থানে আমরা সকলে আপন-আপন শয্যায় ব'সে নিত্য নূতন ভাবের মাতৃলীলা দর্শন ক'রতাম, এবং মায়ের খেয়াল-অনুযায়ী লীলায় অংশগ্রহণ ক'রতাম।

শুক্রবার (১০।৬।৩৭), এক অপ্রত্যাশিত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘট্লো। মন্দিরের সাম্নে একটু উঁচু চত্বরে, একপাশে মায়ের শয্যা পাতা হ'ত। ভোলানাথ চত্বরের অন্য পাশে শুতেন। মাঝে আর-আর মেয়েদের বিছানা প'ড়তো। মায়ের ঠিক পায়ের নীচে ভাইজীর শয্যার একটু স্থান একেবারে সংরক্ষিত (reserved) ছিল। একটু নীচে চওড়া বারান্দায় আমরা (মায়ের অন্য ছেলেরা) বিছানা পাত্‌তাম। মেঝেটা সব ছিল মাটির। মা, ভোলানাথ ও মেয়েরা যে উঁচু চত্বরে শুতেন, সেটা ছিল মোটামুটি সমতল। আমরা যে বারান্দায় শুতাম, তার মেঝেতে মাঝে মাঝে গর্ত ছিল। সেজন্য আমরা কেউই সমান ভাবে বিছানা পাত্‌তে পারতাম না। ঐ রাত্রে, আমরা সকলে যখন আপন-আপন শয্যায় ব'সে ছিলাম, তখন গুরুপ্রিয়া দিদি—মায়ের কৈলাস-যাত্রায় পরবার জন্য যে গরম কাপড়ের কান-ঢাকা টুপি তৈয়ার করা হয়েছিল—সেই টুপি মায়ের হাতে দিলেন, মায়ের প'রে দেখার জন্য। টুপিটা একটু আঁট্ হচ্ছে, দেখা গেল। তাই দেখে, ভোলানাথ (তখন মৌনী ছিলেন) ইসারা ক'রে ব'ল্লেন,—টুপিটা আমাকে দাও, আমি প'রলে একটু ঢিলে হয়ে যাবে। এর উত্তরে, খুব ছোট শিশুর মতো মুখ-ভঙ্গি ক'রে—আদরের

স্বরে মা ভোলানাথকে ব'ললেন,—তুমি সাবান মাখো না, তোমার মাথায় গন্ধ, তুমি টুপি প'রো না। ভোলানাথের মাথায় ছিল ছু'টো বড় বড় জটা। তিনি সন্ন্যাসীও ছিলেন। সুতরাং তাঁর সাবান ব্যবহার করার প্রশ্নও ওঠে না। একটু ভাব্‌লেই বুঝা যায় যে, মায়ের কথাগুলো ছিল নির্দোষ, নিছক ঠাট্টা। কিন্তু মায়ের কথাগুলো শুনেই ভোলানাথ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হ'লেন। নিজের বিছানায় ব'সে উচ্চৈঃস্বরে, আধ-মৌন-ভাবে তিনি যে-সব ব'ল্‌লেন, তা'তে বুঝা গেল যে, মায়ের কথায় তিনি অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং নিজেকে অপমানিত বোধ ক'রেছেন। তিনি ক্রমশঃ আরও চেঁচিয়ে, নানাপ্রকারে তাঁর ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ ক'রতে লাগলেন। আমরা সব যে যার বিছানায় স্তম্ভিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে ব'সে রইলাম। হঠাৎ, মা তাঁর শয্যা ছেড়ে, বিদ্যুদ্‌বেগে ভোলানাথের দিকে এগিয়ে গেলেন, এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, একটু নীচু হ'য়ে, তাঁর মুখের কাছে ড'ান হাতের তর্জনী তুলে পরিষ্কার অনুচ্চ-কণ্ঠে ব'ললেন,—তোমাকে যত কিছু না বলি, তুমি ততই বাড়াচ্ছ। চুপ্‌! চুপ্‌! চুপ্‌! এই সুদৃঢ় আদেশে ভোলানাথ অসহায় পুতুলের মতো চুপ্‌ ক'রে ব'সে রইলেন। মা'-ও ক্ষিপ্র-গতিতে, কাছেই মন্দিরের যে দরজা ছিল, সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এই সময়ে মায়ের চলার গতি এতো ত্বরিৎ ছিল যে, মনে হ'চ্ছিল—মা যেন মাটি-ছাড়া হ'য়ে শূন্যে চলেছেন। একটু পরেই, অপরদিকের দরজা দিয়ে মন্দিরে ঢুকে, মা ফিরে এসে নিজের শয্যায়

ব'সলেন। সেই সময়ে, রোষ-পরায়ণা বিদ্যুতের মতো চঞ্চল-গতি মা-কে দেখে আমার পুরীর সমুদ্রের কথা মনে হ'য়েছিল। সমুদ্রের উপরে যখন উত্তাল তরঙ্গের চঞ্চল উত্থান-পতন চলে, তখনই—আমি সমুদ্রে ডুব দিয়ে দেখেছি—ভিতরে সমুদ্র থাকে শান্ত, নিস্তরঙ্গ। মায়েরও দেখ্‌লাম—বাইরে (চেহারায় ও ক্ষিপ্র গতিতে) উদ্দাম রোষ ও ঝড়ের চাঞ্চল্য। কিন্তু অন্তরে যে তাঁর স্থির প্রশান্তি ও দিব্য আনন্দ অব্যাহত ছিল, তা' বেশ বুঝা যাচ্ছিল।

মায়ের ঐ রকম শাসনে, ভোলানাথ বিহ্বল হ'য়ে তখনকার মতো চুপ ক'রলেন বটে, কিন্তু একটু পরেই তাঁর ক্ষোভ ও ক্রোধ দ্বিগুণিত হ'ল। তিনি নিজের শয্যা থেকে উঠে, বেগে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেলেন, এবং যাবার সময় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, তিনি মায়ের সঙ্গে কৈলাসে যাবেন না। যাই হোক্, আমরা (আমি, নগেন *, মানিক ও টুনু) তখনই মন্দির থেকে বেরিয়ে গিয়ে, আলমোড়ার বাজারের পথে, ভোলানাথের গতিরোধ করলাম। সকলে মিলে, তাঁর কোমর জড়িয়ে ধ'রে, ও পায়ে ধ'রে অনুরোধ ক'রলাম মন্দিরে ফিরে যেতে। তাঁর অত দুর্জয় ক্রোধ অতি সহজেই প্রশমিত হ'ল। সুবোধ শিশুর মতো ফিরে এসে তিনি নিজের শয্যায় শুয়ে প'ড়লেন। তখন তাঁকে দেখে কে ব'লবে যে এই ভাল-মানুষ সন্ন্যাসীঠাকুর মাত্র কুড়ি মিনিট

---

* নগেন দে ক'লকাতায় বিশিষ্ট মিষ্টান্ন-ব্যবসায়ী ; ৩০ পৃষ্ঠা দেখুন।

আগে ছিলেন অত্যুগ্র দুর্বাসা-মুনির জীবন্ত প্রতিমূর্তি। লীলাময়ী মায়ের একটা নির্দোষ ঠাট্টা বুঝতে না পেরে হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ করা, আবার প্রায় পর-মুহূর্তে আমাদের অনুনয়ে শান্তভাবে ফিরে আসা—এই উভয় লক্ষণ দ্বারা ভোলানাথের তপঃপূত চরিত্রের শিশু-সুলভ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়।

ভোলানাথ শান্ত হ'য়ে নিজের বিছানায় শুয়ে প'ড়লে, ছবির-মা আমাদের এই শিশু-স্বভাব গুরুদেবের পা-টিপে, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে, তাঁকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ পরে, ভোলানাথ ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে ক'রে, ছবির-মা নিজের বিছানায় এসে ব'সলেন। তখন মা ছবির-মাকে প্রশ্ন ক'রলেন,—ভোলানাথ ঘুমিয়েছে কি? ছবির-মা উত্তর করেন,—হ্যাঁ, বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন। মা ব'ললেন,—না, ভোলানাথ ঘুমায়নি। আরও ব'ললেন,—ভোলানাথ যদি না ঘুমিয়ে থাকে, তুমি আমাকে কি দেবে? ছবির-মা উত্তর ক'রলেন,—তোমাকে আমি একখানা সিল্কের শাড়ী দেবো। ঐ নূতন লালপাড়-শাড়ী ছবির-মা সঙ্গে এনেছিলেন—মা-কে ঐ শাড়ী পরিয়ে সাজিয়ে কৈলাস-যাত্রায় পাঠাবেন—এই আশা ক'রে। কিন্তু লীলাময়ী চাইলেন, ঐ শাড়ীখানাই আদায় ক'রতে বাজী ধরার মাধ্যমে। আমি একবার ছবির-মায়ের পক্ষ হ'য়ে ব'ললাম,—মা, তুমি বাজী হারলে কি দেবে, তা' তো ব'ল্লে না? সর্বক্ষেত্রে বিজয়িনী, অদ্বিতীয়া মা সগর্বে উত্তর ক'রেছিলেন,—আমার হারবার প্রশ্ন উঠে না।

এর পরে, ভোলানাথের কাছে গিয়ে ছবির-মা অনুচ্চ-স্বরে একবার 'বাবা' ব'লে ডাক্‌তেই, ভোলানাথ চোখ চাইলেন। তা'তে বুঝা গেল যে, ভোলানাথ ঘুমান নি। সুতরাং, মা অনায়াসে বাজী জিতে সিল্কের শাড়ীখানা পেয়ে গেলেন।

পরের দিন (শনিবার ১২।৬।৩৭) সকাল দশটার পরে, ছবির-মা মায়ের চুলে বেশ ক'রে সুগন্ধ তেল মাখিয়ে, চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে, ছু'টো বেণী ক'রে, কপাল বেড় দিয়ে, বেঁধে দিলেন, এবং ব'লে দিলেন,—তুমি বেণী খুলো না—তুমি কৈলাস থেকে ফিরে এলে, আমি আলমোড়ায় এসে তোমার বেণী খুলে দেবো। পরে, বাজীতে-জেতা লাল-পাড় সিল্কের শাড়ী, ওভারকোট প্রভৃতি পরিচ্ছদে মা-কে সাজিয়ে, আমার হাতে যে ক্যামেরা ছিল—তার সাহায্যে মায়ের কয়েকটা ফটো * তোলা হ'ল।

মন্দিরের বাইরে, ফটো তোলার পর্ব শেষ হ'লে, মা এমন একটা অপ্রত্যাশিত লীলা ক'রলেন, যা'তে বুঝা যায় যে, তিনি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু—ভক্তের ইচ্ছা-পূরণে সর্বদাই প্রস্তুত। ছবির-মা কোনও সময়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন এই ব'লে,—মা, তুমি যখন ঘরের বৌ ছিলে, তখন তো তোমাকে আমি দেখি নি। আমার খুব দেখতে ইচ্ছা করে, তোমাকে বৌ সাজলে কেমন দেখায়। মন্দিরে ফিরে

---

* ঐসব ফটোর একটাও ওঠে নি। আমার ধারণা, মায়ের কৃপা ছাড়া, তাঁর ফটো তোলা যায় না। ইচ্ছাময়ী খেয়াল-মতো নিজের মূর্তি ক্যামেরার নাগালের ভিতরে বা বাইরে রাখতে পারেন।

আসবার সময়ে, মা, হঠাৎ—শাড়ী-পরা অবস্থায়—ছবির-মাকে ব'ল্‌লেন,—মা, বৌ-অবস্থায় আমি কেমন দেখ্‌তে ছিলাম —তুমি দেখ্‌তে চেয়েছিলে—এস দেখ্‌বে। এই ব'লেই মন্দিরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গেলেন। ছবির-মাও আমাকে ডেকে সঙ্গে নিলেন। আরও দু'-তিন জন (বোধ হয় ভাইজী ও গুরুপ্রিয়া দিদি তার মধ্যে ছিলেন) আমাদের সঙ্গে গেলেন। মন্দিরের একটা নির্জন কোণে গিয়ে, মা, এক-গলা ঘোম্‌টা দিয়ে, বৌ সেজে, নানারকম ভঙ্গী ক'রে আমাদের দেখালেন। তার মধ্যে আবার দেখালেন—ভাসুরকে খাদ্য পরিবেশন ক'রতে হ'লে, বৌ ঘোমটার ভিতর থেকে এক-চোখে কি-ভাবে দেখে। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই মহা-আনন্দে এই লীলা দর্শন ও উপভোগ ক'রলেন।

ঐ দিন সন্ধ্যার পর, কৈলাস-যাত্রার নানাবিধ তোড়-জোড় চ'লছিল। মা নিজ-হাতে প্রত্যেকটি যাত্রীর জন্য আলাদা আলাদা কৌটায়, পথে খাওয়ার জন্য পেস্তা, বাদাম ও কিস্‌মিস্‌ ভ'রেছিলেন। ভাইজীর কৌটাটা তাঁর হাতে দিয়ে ব'ললেন,—এখন যেন খাস্‌নে। ভাইজী তো অন্তরে-বাইরে, সব সময়ে, নিজেকে মায়ের শিশু মনে ক'রতেন। দুষ্টু ছেলের মতো, মায়ের-হাত-থেকে-পাওয়া নিজের কৌটা তখনই খুলে, হাস্‌তে হাস্‌তে একটা-দুটা ক'রে শুক্‌না ফল খেতে লাগ্‌লেন। মায়ের সামনে তাঁর এই দুষ্টু ছেলের যথাযথ অভিনয় দেখে আমরা সকলেই খুব হেসেছিলাম। সদা-হাস্যময়ী মা-ও তা'তে যোগ দিয়েছিলেন।

পরের দিন (১৩৬।৩৭) রবিবার প্রাতে যাত্রার প্রাক্কালে আমি আবার একবার নিষ্ফল চেষ্টা ক'রলাম, মায়ের ফটো তোলার জন্য। কিন্তু আমার ক্যামেরার একটা ছোট স্ক্রু মাটিতে পড়ে গিয়ে ধুলায় হারিয়ে গেল। আমি যখন এক-মনে ঐ স্ক্রুটা খুঁজতে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ কে আমাকে ব'ল্‌লো —মা রওনা হচ্ছেন, আপনাকে ডাক্‌ছেন। দৌড়ে মন্দির-কম্পাউণ্ডের বাইরে গিয়ে দেখি—সমস্ত দল আগেই রওনা হ'য়ে গিয়েছেন। শুধু একটা ডাণ্ডিতে-বসা মা ডাণ্ডি নামিয়ে রেখে, আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছেন। আমি গিয়ে, মায়ের চরণ-যুগলে মাথা রেখে, প্রণাম ক'রে, মুখ তুলে দেখলাম, মা প্রশান্ত-মধুর দৃষ্টিতে সোজাসুজি আমার দিকে তাকালেন। এই দৃষ্টিতে আমি আর-একবার সেই প্রথম-বারের অমিয়-দৃষ্টির (৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা) এবং তজ্জনিত দিব্য আনন্দের আভাস পেলাম।

এর পরে, মা ডাণ্ডিতে চেপে, অগ্রগামী সহযাত্রীদের পিছনে পিছনে যাত্রা-পথে এগিয়ে গিয়ে, পাহাড়ী রাস্তার বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হলেন। আমরা যারা মা-কে কৈলাসের পথে পৌঁছে দিতে বাইরে থেকে এসেছিলাম—তা ছাড়া স্থানীয় বহু স্ত্রী ও পুরুষ ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন—মায়ের কৈলাস-দর্শনের জন্য—সকলেই মায়ের বিরহে অশ্রুমোচন ক'রতে লাগ্‌লেন।

* * *

ঐ দিনই আমরা আলমোড়া ত্যাগ করি বাস্-যোগে।

কাঠগুদামে ট্রেণে উঠে, নিউ দিল্লীতে আমাদের বাসায় পৌঁছাই সোমবারে (১৪ই জুন ১৯৩৭) সকালে। দেখে সন্তুষ্ট হ'লাম যে মায়ের কৃপায় ছেলে-মেয়েরা, যেমন দেখে গিয়েছিলাম, তেমনই সুস্থ, হাসি-খুসী আছে।

তার পরে, পূজার ঘরে মায়ের ফটো ও গোপালের মূর্তির সামনে প্রণাম ক'রে আমরা আপন-আপন সাংসারিক কর্তব্যে মনোনিবেশ ক'রলাম।

পঞ্চম অধ্যায়

বিপত্তারিণী মা

মায়ের ভক্তদের সঙ্গে নিজেদের সুখ-দুঃখ, আধি-ব্যাধি, নানাবিধ সংকট-বিপদ সম্বন্ধে পরস্পর আলোচনা ক'রে এবং মায়ের সম্বন্ধে যেসব পুস্তক ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি প'ড়ে আমার স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছে যে,—মায়ের প্রত্যেক ভক্ত—বিশেষতঃ প্রত্যেক পুরানো ভক্ত—অনেক আপদ-বিপদে,—মারাত্মক রোগে, সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় বা উৎকট অভাব-অনটনে, মায়ের কৃপায় অচিরে এবং সহজে বিপন্মুক্ত হয়েছেন। এইসব সংকট-মোচনের কাহিনী সব সংগ্রহ ক'রে ছাপালে একটা বিরাট 'মহাভারত' হ'য়ে যাবে। এই অধ্যায়ে, যেসব ঘটনায় আমি নিজে জড়িত অথবা নিজে জানি, তারই কয়েকটা বিবৃত ক'রবো।

১৯৩৭ সালের মার্চে মা-কে আমি নিউ দিল্লীতে প্রথম দর্শন করি। ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে আমি বালিগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অবৈতনিক সেক্রেটারি নির্বাচিত হই। আমার পঞ্চম ভ্রাতা সুনীল ঐ কলেজ স্থাপন ক'রেছিল। সে ছিল কলেজের সুপারিণ্টেন্‌-ডেন্‌ট্‌ ও সেক্রেটারি। তার অধীনে কাজ করতেন অধ্যক্ষ জে. বি. রায়। পরে, নানারকম দলাদলির জন্য বিরক্ত হয়ে, সুনীল লম্বা ছুটি নেয় এবং অধ্যক্ষ রায় সেক্রেটারি হন।

জুলাই মাসে যে দিন আমি কলেজের অফিসে যাই সেক্রেটারির কার্যভার বুঝে নেওয়ার জন্য, সেই দিনই, অধ্যক্ষ রায়ের প্ররোচনায় কয়েকটি ছাত্র আমাকে বাধা দেয়। নিজের স্বার্থে, অধ্যক্ষ রায় ছাত্রদের বুঝিয়েছিলেন যে, আমি খুব কড়া লোক, এবং আমি সেক্রেটারির দায়িত্ব পেলে, ছাত্ররা না-কি কেউই পাস ক'রতে পারবে না। এতে ছাত্ররা আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়েছিল। প্রথমে, কয়েকজন উদ্ধত ছাত্রের সঙ্গে আমার কথা-কাটা-কাটি হয়। পরে, যে-সব ছাত্র আফিসে জড়ো হয়েছিল, তারা সহসা আমাকে মারতে উদ্যত হয়। আমি তখন পাশের একটা ঘরে চলে গিয়ে, দরজা বন্ধ করি। উত্তেজিত ছাত্ররা দরজা ভাঙতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভাঙতে পারে না। ঐ ঘরে আবদ্ধ হ'য়ে, ব'সে ব'সে আমি চণ্ডীর দুটো শ্লোক বার বার আবৃত্তি ক'রে, আমাদের মায়েরই সাহায্য ভিক্ষা ক'রতে লাগলাম। শ্লোক দুটো ছিল ঃ

(১) রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধি মধ্যে
তত্রস্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥

(২) বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতি ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তি নম্রা॥

[যেখানে রাক্ষসদল ও উগ্রবিষ সর্পকুল, যেখানে শত্রু ও

দস্যুদল, সেখানে এবং সমুদ্রমধ্যেও উপস্থিত থেকে, তুমি বিশ্ব পালন ক'রছ। বিশ্বেশ্বরী তুমি, বিশ্ব পালন ক'রছ। বিশ্বাত্মিকা তুমি, বিশ্বকে ধারণ ক'রে আছ। তুমি বিশ্বপূজ্যা। তোমাতে যারা ভক্তিনম্র, তারা বিশ্বের আশ্রয়-স্বরূপ।]

এর মধ্যে কলেজের হেড্ ক্লার্ক টেলিফোন ক'রে আমার ভাইদের, কলেজের প্রেসিডেণ্ট্ (ডক্টর বি. এন্. দে)-কে এবং পুলিশকে জানিয়ে দেন যে, অধ্যক্ষ রায়ের প্ররোচনায় ছাত্ররা আমাকে একটা ঘরে আবদ্ধ ক'রেছে। এবং আমি বেরুলেই আমাকে মেরে ফেলবে ব'লে ভয় দেখাচ্ছে।

ঐ-ভাবে, প্রার্থনা-রত অবস্থায় প্রায় আধ ঘণ্টা কাটলে, আমার ষষ্ঠ ভ্রাতা বীরেন এসে আমার দরজায় ঘা' দেয়। আমি দরজা খুলে, তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বলি,—পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে, পুলিশ এলে আমরা দু'জনে পুলিশের সঙ্গে বেরিয়ে যাবো। অল্পক্ষণ পরে, বাইরে একটা চেঁচামেচি হচ্ছে শুনে বীরেন বললো,—আমার পিছনে শ্যাম (আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) আসছিল, তা'কে বোধ হয় একলা পেয়ে, ছাত্ররা মারছে। এরপরে, বীরেন ও আমি বেরিয়ে প'ড়লাম, এবং শীঘ্রই দু'পক্ষের মধ্যে ঘুষাঘুষির একটা তীব্র লড়াই লেগে গেল। একদিকে আমরা তিন ভাই এবং অপরদিকে ৪০।৫০ জন ছাত্র। এই অ-সমান লড়াইতে আমার দুটো দাঁত ভেঙে যায় এবং আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হ'য়ে পড়ি। এই অবস্থায় একজন ছাত্র, তিন ফুট লম্বা একটা ভারী লোহার পাইপ তুলে আমাকে মারতে উদ্যত হয়। আমি

তখন উবু হ'য়ে ব'সে, দু'হাত দিয়ে মাথাটা ঢেকে, মা-কেই স্মরণ ক'রতে থাকি। পাইপের আঘাত আমার পিঠে প্রায় পৈতার আকারে—কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত কোনাকুনি—একটা এক-ইঞ্চি চওড়া লাল-কালো কালশিরার দাগ সৃষ্টি ক'রলো। একটা আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ঐ প্রচণ্ড আঘাতের ব্যথা—ঐ সময়ে বা পরে কোনও সময়ে—আমি একটুও বুঝিনি। কিন্তু, আঘাত লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার ভিতর থেকে একটা স্পষ্ট আদেশ এল,—"প'ড়ে যা", এবং কে যেন আমাকে সজোরে পাশের দিকে ঠেলে শুইয়ে দিলে। আমিও ঐ আদেশের অনুবর্তী হয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছি, এমন ভান ক'রলাম। আঘাতে যদি আমি বেশী ব্যথা পেতাম, তা'হলে নিশ্চয়ই যন্ত্রণা-সূচক আওয়াজ আমার মুখ দিয়ে বেরুত, এবং আমি কিছুতেই চুপ-চাপ থেকে নিখুঁতভাবে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ভান ক'রতে পারতাম না। নিশ্চলভাবে আমি পড়ে আছি দেখে, দু'-চার জন শিক্ষক—যাঁরা নিরপেক্ষভাবে সবকিছু দেখে যাচ্ছিলেন—হঠাৎ 'ম'রে গেছেন', 'ম'রে গেছেন' ব'লে চিৎকার ক'রে উঠলেন। তা'তে দাঙ্গা-বাজ ছাত্রের দল ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়ে, বাড়ীটার তিন তলায় হোস্টেল ছিল—সেখানে আশ্রয় নিল। পরে, পুলিশ সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর কয়েকজন কনষ্টেবলসহ এসে—সব বিবরণ শুনে, হোষ্টেল থেকে ৮।১০ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার ক'রে নীচে নামিয়ে এনে বসিয়ে রাখেন। আমার জ্ঞান হ'লে (অর্থাৎ, ভান-করা বেহুঁস-ভাব ঝেড়ে ফেলে, আমি উঠে ব'সলে),

সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর আমার বয়ান লিখে নিয়ে ছাত্রদের থানায় নিয়ে গেলেন। যাবার সময়ে অধ্যক্ষ রায়ের বাসস্থানের ঠিকানাও নিয়ে গেলেন। সেখানে অধ্যক্ষ রায়কেও গ্রেপ্তার করা হয়। শেষ পর্যন্ত, অধ্যক্ষ রায় ও ধৃত ছাত্ররা আমার কাছে নিঃসর্ত ক্ষমা-প্রার্থনা ক'রলে, যে মোকদ্দমা রুজু করা হ'য়েছিল, তা' তুলে নেওয়া হয়।

আমি আজও ভেবে ঠিক ক'রতে পারি না যে, ঐ সাংঘাতিক আঘাতের কোনও ব্যথা বা যন্ত্রণা কেন আমি পেলাম না। অথচ, ঐ আঘাতের সুস্পষ্ট দাগ দেখেই পুলিসের সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর বিশেষ মর্মাহত হ'ন এবং ছাত্রদের ও অধ্যক্ষ রায়কে গ্রেপ্তার করেন। এইসব গোলমালের পরে, অধ্যক্ষ রায় পদচ্যুত হন এবং ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এগারো বৎসর-কাল আমাকে ক্যাল্‌কাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারির পদে কাজ ক'রতে হয়।

ঐ কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে আমার আবার একটা গোলমাল বাধে ১৯৪৮ সালের মে মাসে। ছাত্রদের মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এই নিয়ে যে,—ক্যাল্‌কাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কোনও সরকারী অনুমোদন পায়নি। অথচ, এর পরিচালক-মণ্ডলী একে সরকার-অনুমোদিত ব'লে মিথ্যা প্রচার করে। এই উত্তেজনা-জনিত আন্দোলন যখন প্রবল হয়, তখন আমি পরিচালক-মণ্ডলীর বক্তব্য বুঝাবার জন্য একটা ছাত্র-সভার আয়োজন করি। এই সভাতে

পশ্চিম-বঙ্গ রাজ্য-সরকার ছাড়া, মধ্যপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি রাজ্য-সরকার—যাঁরা আমাদের কাছে আমাদের পাস-করা ছাত্র নিয়োগ ক'রতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন এবং নিয়োগও ক'রেছিলেন,—তাঁদের কতকগুলি চিঠি—যেগুলি একটা ফাইলে একত্র করা ছিল—প'ড়ে শুনিয়ে দিই। তা'তে ছাত্রনেতারা বলে,—আমরা ও-সব বিশ্বাস করি না। তখন আমি বলি,—এগুলি যদি বিশ্বাস না কর, তা'হলে আমার আর কিছু বলবার নেই,—আমাকে এখান থেকে যেতে দাও। ছাত্রনেতারা স্পষ্টভাবে বলে,—আপনাকে যেতে দেবো না। তখন প্রথমেই আমার মনে হয়,—ঘুষি মারতে মারতে, পথ ক'রে বেরিয়ে যাই। কিন্তু ভিতর থেকে একটা পরিষ্কার সতর্কবাণী শুনলাম,—'পারবে না, চেষ্টা ক'রো না'। এই ধরনের সতর্কবাণী আমার জীবনে আরও কয়েকবার আমাকে অবশ্যম্ভাবী গুরু-বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রেছে। ঐ বাণী শুনেই আমার আচরণ একেবারে পরিবর্তিত হ'ল। কোট-প্যাণ্ট-পরা আমি তখনই ঐ মঞ্চের উপরেই (যেখান থেকে আমি কথা ব'লছিলাম) মেরুদণ্ড, শির ও গ্রীবা সিধা রেখে, চোখ বুজে, যোগাসনে নিশ্চলভাবে ব'সে মা-কে (মা ও কৃষ্ণ তো আমার কাছে অভেদ ছিলেন) প্রার্থনা জানাতে লাগলাম এই ভাষায়,—মা, কৌরব-সভায় দুঃশাসন-কর্তৃক-নিগৃহীতা দ্রৌপদী যখন নিজের সব চেষ্টা ত্যাগ ক'রে দু'-হাত তুলে তোমাকে ডেকেছিলেন, তুমি তো তাঁর সম্মান রক্ষা ক'রেছিলে। আজ, আত্মরক্ষার সব চেষ্টা ছেড়ে, আমি

তোমার শরণাপন্ন হ'লাম। এই শার্দ্দুলের দলের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও; কৃপা করো। এইভাবে বোধ হয় তখন পাঁচ মিনিটও কাটেনি, একজন ছাত্র হঠাৎ চেঁচিয়ে বললো,— 'অজ্ঞান হ'য়ে গেছেন'। আমি তো অজ্ঞান হইনি, আমি ঐ কথা শুনলাম। এদিকে ঐ সভা-গৃহের বাইরে আমার বিশ্বাসী ও সাহসী রাজপুত দ্বারোয়ান—যে একটা গোলমাল আশঙ্কা ক'রে নিকটেই পায়চারি ক'রছিল—ঐ চিৎকার শুনে, 'হটিয়ে', 'হটিয়ে' ব'লতে ব'লতে, ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে এসে আমাকে তুলবার চেষ্টা ক'রলো। দু'-তিনজন সৎ-ছাত্রও তা'কে সাহায্য ক'রলো। এইভাবে দ্বারোয়ান যখন আমাকে পাঁজা ক'রে তুললো, তখন আমি নিজের মাথাটা তার কাঁধের উপর রাখলাম। দ্বারোয়ান ঐভাবে বাহির ক'রে নিয়ে গিয়ে আমার আপিস-ঘরে একটা চেয়ারে আমাকে ব'সিয়ে দিল। আমিও মাথাটা সামনের টেবিলের উপর রেখে, চোখ বুজে নিশ্চলভাবে ব'সে রইলাম। আমি হয়তো মরে যেতে পারি—এই রকম আশঙ্কা ক'রে—পাছে তাদের আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী হ'তে হয়, এই ভয়ে, অধিকাংশ ছাত্রই সভা ভেঙে, কলেজ থেকে বেরিয়ে গেল। দু'-চারজন অতি-সাহসী নেতৃস্থানীয় ছাত্র, আমার আপিস-ঘরের বাইরে পায়চারি ক'রে, জানালা দিয়ে দু'-তিনবার দেখলো। যখন তাদের মনে হ'ল, আমার অজ্ঞান ভাব কাটছে না, তারাও সভয়ে দ্রুতগতি কলেজ ত্যাগ ক'রলো। আমি যখন বুঝলাম —আমার ধারে-কাছে ছাত্ররা কেউ নেই, তখন মনে-মনে

মা'-কে প্রণাম ক'রে, উঠে হাসতে-হাসতে কলেজ থেকে বেরিয়ে গেলাম। মনে হ'চ্ছিল,—মা'-কে যে আশ্রয় ক'রেছে, কোনও দানবের সাধ্য কি যে তার কেশাগ্রও স্পর্শ করবে ?

এইবার, একটা ঘটনা বিবৃত ক'রবো, যেটা মায়ের প্রত্যক্ষ শারীরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া আমার পক্ষে একটা মারাত্মক তুর্ঘটনায় পরিণত হ'তে পারতো। ক'লকাতায় মা তো আমাকে ব'লেছিলেন (৩৬ পৃষ্ঠা),—তোমার মনে যদি কোনও প্রশ্ন আসে, মনে-মনে প্রশ্ন ক'রো, জবাব পাবে। বার বার মায়ের কৃপায় নানারকম বিপদ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ধার হ'য়ে আমার মনে একটা উদ্ভট প্রশ্ন এল। আমি ভাবলাম যে,—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে, 'আমি কোনও পক্ষে অস্ত্র-ধারণ ক'রবো না'—এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রতে উদ্যত হ'য়ে, কৃষ্ণ তো তু'বার অর্জুনের পক্ষ হ'য়ে, একবার চক্র নিয়ে, আর একবার অশ্ব-চালনার বেত্র (চাবুক) নিয়ে, অর্জুনের মহাবলী আততায়ী ভীষ্মের প্রতি ধাবমান্ হয়েছিলেন। আচ্ছা, আমার কোনও আততায়ী যদি এই সশরীরী আনন্দময়ী মায়ের উপস্থিতিতে আমাকে আক্রমণ করে, মা কি সেই আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রে আমাকে বাঁচাবেন না ? দিনের পর দিন এই অবোধ-বালকোচিত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি। একদিন কি ক'রে অভাবনীয় ভাবে এই অতি-অদ্ভুত প্রশ্নের সমুচিত জবাব পেলাম, তা' লিপিবদ্ধ ক'রছি। একদিন (সন-তারিখ মনে ক'রতে পারছি না), আমরা কয়েক জন ট্রেণে চেপে নবদ্বীপ থেকে ফিরছিলাম।

মা ঐ ট্রেণে ফার্ষ্ট ক্লাসে ছিলেন। আমি, যতীশ-দা' (*), রুমাদেবী (†), বুনি (‡), আরও কেউ কেউ থার্ড ক্লাসে আসছিলাম। কোন ষ্টেশনে যেন মা ফার্ষ্ট ক্লাস থেকে নেমে, আমাদের থার্ড-ক্লাস গাড়ীতে উঠলেন। মা উঠে, আমাদের পাশের কামরায় বুনির কোলে মাথা রেখে শুলেন। আমাদের কামরায় আমি ছাড়া রুমাদেবী ও যতীশ-দা'ও ছিলেন। আমাদের বেঞ্চি আর মায়ের বেঞ্চির মাঝখানে ছিল হেলান্-দেওয়ার কাঠের অনুচ্চ পার্টিশান। যতীশ-দা' আমাকে ব'ললেন,—ভায়া, ভিড় হ'তে দিও না, রুমাদেবী ট্রেণে উঠলে অসুস্থ হ'য়ে পড়েন, ভিড় হ'লে অসুবিধা হ'বে। প্রতি ষ্টেশনে ট্রেণ থাম্‌লেই—আমি তো দরজার কাছেই ব'সেছিলাম—আমি ভিড় আট্‌কাই। একটা কোন ষ্টেশনে, তিনজন বলিষ্ঠ যুবককে আট্‌কাতেই, একটা গোলমাল হ'ল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে আঘাত ক'রতেই, আমি ডান-পা উদ্যত ক'রলাম তা'কে লাথি মারার উদ্দেশ্যে। হঠাৎ দেখ্‌লাম—মায়ের সমগ্র ডান্-হাত পার্টিশানের ও আমার ডান-কাঁধের উপর দিয়ে সোজাসুজি প্রসারিত হ'য়েছে। আমার ভয় হ'ল যে, মা

---

* যতীশচন্দ্র গুহ, ক'লকাতার এড্‌ভোকেট্। ইনি এখন পরলোকে।

† রুমাদেবী ছিলেন শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী-মাতার মন্ত্রশিষ্য। এই সেবাব্রতধারিণী বৃদ্ধা পাহাড়ী মহিলা মায়ের সঙ্গে আসেন, যখন মা কৈলাস দর্শন ক'রে ফিরছিলেন। বহু বৎসর মায়ের কাছে বিভিন্ন আশ্রমে থেকে ইনি মায়ের সেবায় ও নিজের সাধন-ভজনে রতা ছিলেন। ইনি মহাপ্রয়াণ করেছেন কাশী-আশ্রমে ১৯৫৩ সালে ৭ই মার্চ তারিখে।

‡ বুনির পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে, ৩৯ পৃষ্ঠায়, পাদটীকায়।

হয়তো আমার লাথি-মারার উত্তোগটা দেখ্‌তে পেয়েছেন। আমি তৎক্ষণাৎ উদ্যত পা'টা গুটিয়ে নিলাম। একটু পরেই, মা নিজের প্রসারিত হাত টেনে নিলেন। এবং বসা-অবস্থাতেই ব'ললেন,—আমি তো বুনির কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলাম। শুয়ে শুয়ে দেখ্‌ছি—নরেনের মাথায় রক্ত। এরকম কিছু দেখ্‌লে, শরীরটা সাধারণতঃ চুপ্‌-চাপ্‌ প'ড়ে থাকে। আজ হঠাৎ শরীরটা উঠে ব'সে ঐরকম ক'রলো। এর মধ্যে ঐ আক্রমণকারীদের কথা আমার কিছুই মনে হয়নি—আমার মনটা সম্পূর্ণরূপে মায়ের দিকে ছিল। এবং আমি দরজার দিকে আদৌ তাকাই নি। মায়ের সব কথা শোনার পরে, আমি দরজার দিকে দৃষ্টি ক'রে দেখি,—কেউ নেই। আমার মনে হ'ল, মায়ের কোনও রকম ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে, আক্রমণকারীরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মায়ের ভক্ত-রক্ষণাত্মক আচরণে ও কথায়, আমার আজ্‌গুবি প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব পেলাম। বুঝলাম, স্ত্রী-শরীর-ধারিণী আনন্দময়ী মায়ের কোনও আশ্রিত ভক্ত যদি তাঁর উপস্থিতিতে কোনও আততায়ী দ্বারা আক্রান্ত হয়, মা-ও কৃষ্ণের মতোই কার্যকর ব্যবস্থা নিয়ে ভক্তকে বাঁচান। এইটুকু মাত্র প্রভেদ যে, মা-কে কোনও অস্ত্র ধারণ ক'রতে হয় না—দৃষ্টির দ্বারাই তিনি ভক্তের শত্রুকে পরাভূত করেন।

এরপরে, ১৯৪৭ সালে, আমি কি-ভাবে মায়ের কৃপায়, একটা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার আসন্ন সম্ভাবনা থেকে বেঁচেছি, তার বর্ণনা দিচ্ছি। ১৯৪৬

সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক'লকাতায় পার্ক-সার্কাস্ অঞ্চলে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার বিস্ফোরণ হয়, তা' ক্রমশঃ রাজাবাজার, মেছোবাজার, খিদিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তার জেরও ঐসব অঞ্চলে কয়েক মাস ধরে চ'লেছিল। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে যে দিন ভোরে আমি, একজন শিক্ষক (তাঁর পদবী 'ঘোষ') এবং একজন ছাত্র (এর পদবী 'কুমার')-কে নিয়ে একটা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে মোটরে বসিরহাটে যাই, তার আগে বেশ কয়েকদিন ক'লকাতার অবস্থা শান্ত ছিল। মোটরটা ছিল কুমারের বেবি-অষ্টিন্ সিডান্-বডি (ঢাকা) গাড়ী। যখন ক'লকাতায় ফিরি, তখন রাত্রি দশটায় আমাদের গাড়ী শ্যামবাজারের পাঁচ-মাথার মোড়ে পৌঁছেচে। কুমার গাড়ী চালাচ্ছিল। ঘোষ ব'সেছিলেন তার পাশে সাম্‌নের সিটে। পিছনের সিটে আমি একাই ব'সেছিলাম বাঁ-দিক ঘেঁষে। আমার পাশে দরজাটার কাঁচটা নামানো ছিল। আমাদের মতলব ছিল—সার্কুলার রোড ধ'রে শিয়ালদার দিকে যাওয়ার। কিন্তু শ্যামবাজারের মোড়ে সব রাস্তাগুলিই অসম্ভব-রকম জনশূন্য ও যানবাহন-বিরল দেখে, কুমার আমাকে ব'ল্‌লো,—স্যার, আজ বোধ হয় হাঙ্গামা হ'চ্ছে, আমি সার্কুলার রোড্ দিয়ে যাবো না। ব'লেই, শ্যামবাজার স্ট্রীটে ঢুকে, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ দিয়ে, কুমার গাড়ী চালালো। এ রাস্তাতেও কোনও ভিড় নেই দেখে, আমিও হাঙ্গামার আশঙ্কা ক'রলাম। নিরুপায় হ'য়ে আমি মা-কেই স্মরণ ক'রতে লাগলাম। আমি কল্পনা ক'রলাম,—মা যেন গাড়ীতে

ব'সে আমাকে কোলে ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার চোখ-দুটো খোলা ছিল, কিন্তু মন ছিল অন্তর্মুখ। একবার আব্ছা ভাবে দেখ্লাম, গাড়ীটা বাঁ-দিকে মোড় ঘুরে হ্যারিসন রোডে ঢুক্‌লো। তারপরে কি হ'ল, তার কিছুই আমি তখন জানতে পারি নি। কারণ, হ্যারিসন রোডেই দুর্বৃত্তরা প্রথমেই একটা বড় কংক্রীটের চাঙ্‌ড়া (এটা পরে গাড়ীর মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল—ওজন ছিল ৯০০ গ্রাম) ছুঁড়ে আমাকে মারে, এবং সেই আঘাতেই আমি বেহুঁস্ হ'য়ে গাড়ীর মধ্যে নিশ্চলভাবে ব'সে থাকি। যখন আমার জ্ঞান হ'ল, চেয়ে দেখি, গাড়ীটা খুব আস্তে চ'লছে। আর, আমার গলার বাঁ-দিকে এবং মাথার পিছনের দিকে একটু একটু জ্বালা অনুভব ক'রলাম। গলায় হাত বুলিয়ে বুঝলাম—গলার চাম্‌ড়া ছ'ড়ে গিয়েছে। মাথায় হাত দিয়ে দেখে বুঝলাম—মাথা থেকে একটু একটু রক্ত প'ড়ছে। আমি তখন ঘোষ ও কুমারকে ব'ল্‌লাম,—গুণ্ডারা আমাকে মেরেছে। ওরা ব'ল্‌লো,—আমরা জানি। আসলে (ওদের মুখে শুনলাম), আমাকে আঘাত করার পরে, গুণ্ডারা মোটরের সাম্‌নে একটা ঠেলা-গাড়ী আড়-ভাবে দাঁড় ক'রিয়ে, মোটরটা থামাবার চেষ্টা করে। কুমার অত্যন্ত দ্রুত গাড়ী চালিয়ে, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ করে। তারা আরও দেখেছিল,—একজন পথচারীকে দাঁড় ক'রিয়ে গুণ্ডারা ইটের আঘাতে তার মাথা ভাঙ্গছে। খুব ভয় পেয়ে, ঘোষ বার বার কুমারকে ব'লছিলেন—আরও জোরে চালাও। আর কুমারও তড়িৎ-বেগে মোটর চালিয়ে কলেজ স্ট্রীটে এসে

পড়ে। পরে, মির্জাপুর স্ট্রীট হ'য়ে আম্‌হার্ষ্ট স্ট্রীটে এসে, কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে, ঘোষ ও কুমার আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু, আমার কোনও সাড়া না পেয়ে, ওরা বুঝেছিল যে, আমি আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছি। আমি ওদের জিজ্ঞাসা ক'রলাম,—মোটর এতো আস্তে চালাচ্ছ কেন ? ওরা ব'ল্‌লো,—কোন ডাক্তারখানায় আপনাকে একটু ফার্ষ্ট এড্‌ (first aid) দিয়ে নিয়ে যাবো মনে ক'রে একটা ডাক্তারের দোকান খুঁজছি। আমি ব'ল্‌লাম,—আজ এখন কোনও ডাক্তারের দোকান খোলা পাবে না—আমাকে ভবানীপুরে আমার বাড়ীতে নিয়ে চলো। কুমার মোটর চালিয়ে, বহুবাজার স্ট্রীট হ'য়ে শিয়ালদার মোড়ে পৌঁছে, ঘোষকে নামিয়ে দিল,—তিনি যাবেন বেলেঘাটায়। তারপরে, কুমার আমাকে জানালো,—স্যার, ভয়ে আমার হাত কাঁপছে—আমি আর গাড়ী চালাতে পারছি না। নিকটে একজন বাঙ্গালী ট্র্যাফিক কনষ্টেবল্‌ দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে ইসারা ক'রে কাছে ডেকে এনে, আমি সব জানালাম। তা'কে মোটরে কুমারের পাশে ব'সতেও অনুরোধ ক'রলাম,—যা'তে কুমার নির্ভয় হ'য়ে গাড়ী চালাতে পারে। কনষ্টেবল্‌ আমাদের সঙ্গে যেতে রাজী হ'লে, তাকে পাশে ব'সিয়ে কুমার সোজা গাড়ী চালিয়ে এনে, আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিল।

ঐ দিন বিপত্তারিণী আমাদের এই মায়ের কৃপাতেই একটা অবধারিত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা-হওয়া থেকে বেঁচেছি। আমি তো শুধু কল্পনা ক'রছিলাম যে,—মায়ের কোলে ব'সে আছি।

মা-ই কিন্তু ত্বরিতে আমার কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়ে, নিজে অলক্ষ্যে থেকে—সত্যই কোলে ক'রে আমাকে বাঁচিয়েছেন। তা'ছাড়া, আক্রমণের সুরুতেই বেহুঁস্ হ'য়ে যাওয়ায়, ঘোষ ও কুমারের যে অতিমাত্রায় ভয়, উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা হ'য়েছিল, তার একটুও অংশ আমাকে নিতে হয় নি। ঐ ভারি কংক্রীটের চাঙ্‌ড়াটা গলার পেশীর উপরে লাগায়, আমার আঘাত একটুও গুরুতর হয় নি। ওটা যদি একটু উপরে লাগ্‌তো, তা'হলে মাথার খুলি ভেঙ্গে যেতো। আবার একটু নীচে লাগলে, কাঁধের হাড় ভেঙ্গে যেতো। শুধু মাথার পিছনে সামান্য কেটে গিয়েছিল, ঐ নিক্ষিপ্ত চাঙ্‌ড়াটার একটা কোণ মাথা একটু স্পর্শ ক'রেছিল ব'লে।

১৯৪৯ সালে আমার আর্থিক অসচ্ছলতার সময়ে করুণাময়ী মা আমাকে নির্ভুল পথ-নির্দেশ দিয়ে অকূলপাথার থেকে কি-ভাবে উদ্ধার ক'রেছিলেন, তার বিবরণ দিচ্ছি। দেশ স্বাধীন হবার পরে, ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে—(যেখানে আমি এগারো বৎসর কাল অধ্যক্ষ ছিলাম)—"রাজনীতির" অনুপ্রবেশ ঘট্‌লো। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তরের ফলে ক্রমে এমন পরিস্থিতি হ'ল যা'তে আমার পক্ষে নিজের পথ দেখা ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। আমার তখন বয়স ৫৫ বৎসর। আমি কিছু সঞ্চয়ও ক'রতে পারিনি। এই সময়ে নিউ দিল্লীতে আমার স্বপ্রতিষ্ঠিত যে বিদ্যায়তন ছিল, আমার দীর্ঘ এগারো বৎসরের অনুপস্থিতিতে (এই এগারো বৎসর আমি ক'লকাতায় ছিলাম), তার ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা এমন সঙ্গীন হ'য়েছিল যে,

বাড়ীভাড়ার এক অংশ আমাকে নিজে দিতে হ'ত। তাই, নিউ দিল্লীর কলেজের ভরসা ত্যাগ ক'রে, ক'লকাতায় কিছু ক'রবো কি-না, স্থির ক'রতে পারছিলাম না। অনেক ভেবে-চিন্তে, শেষ পর্যন্ত ঠিক ক'রলাম যে, ডেরাডুনে গিয়ে, মায়ের মতামত জেনে, নিউ দিল্লী যাবো। এবং, হয় ঐ নির্বাণ-উন্মুখ পুরানো কলেজটাকে নতুন 'তেল-স'ল্‌তে' দিয়ে ভাল ক'রে জ্বালাবো, আর না হ'লে, ওটাকে তুলে দিয়ে, ওর দামী যন্ত্রপাতি ও আস্‌বাব-পত্র বিক্রী ক'রে, কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে ক'লকাতায় স্থায়িভাবে ব'সবো। এটাই ছিল আমার দুরূহ সমস্যা।

ডেরাডুনে গিয়ে. দেখি, মা সমস্ত সময় প্রোগ্রাম-অনুযায়ী সৎসঙ্গে থাকেন, এবং তাঁর সঙ্গে নিরিবিলি সাক্ষাৎ করাও দুষ্কর। তবুও গুরুপ্রিয়া-দিদিকে ব'লে রাখলাম যে, আমার মায়ের সঙ্গে কিছু জরুরী কথা আছে। যে দিন সন্ধ্যায় আমি দিল্লী রওনা হ'ব, সেই দিন বিকালে মা উৎসবের প্যাণ্ডাল থেকে আশ্রমে এসে যখন একটু জল পান ক'রছিলেন, তখন আমি মায়ের সাম্‌নে উপস্থিত হ'লাম। আমি প্রণাম ক'রতেই বেশ ত্রস্তভাবে মা জিজ্ঞাসা ক'রলেন, —বাবা, তোমার কি কথা আছে? শিগ্‌গির বলো। এই অবস্থায়, বিশদ বিবরণ সম্পূর্ণ পরিহার ক'রে, আমি সংক্ষেপে নিবেদন ক'রলাম,—মা, ক'লকাতায় নানারকম অসুবিধা হচ্ছে, তাই আমি মনে করছি দিল্লী যাবো; তোমার কি মত? তখনই মা ব'ললেন,—হ্যাঁ বাবা, দিল্লী যাও। মায়ের

নির্দেশ শিরোধার্য ক'রে নিউ দিল্লীতে আমার কলেজের আপিসে ঢুকে দেখি, হ'জন পাঞ্জাবী যুবক আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। তারা আমাকে ব'ল্‌লো,—স্যার, আমরা দিনের বেলায় সরকারী চাকুরী করি, সন্ধ্যায় মিষ্টার সেনগুপ্তের কাছে A. M. I. E. পড়ি। আমরা একদলে আট জন আছি। আমরা প্রত্যেকে মিঃ সেনগুপ্তকে মাসে মাসে পঁচিশ টাকা ক'রে দিই। কিন্তু তাঁর পড়ানোতে আমরা সন্তুষ্ট নই। আপনি যদি A. M. I. E. ক্লাস খোলেন, আমরা সব আপনার ক্লাসে প'ড়বো এবং আপনাকে প্রত্যেকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে দেবো। আপনি অনুগ্রহ ক'রে আপনার কলেজে A. M. I. E. ক্লাস খুলুন। এইভাবে, মায়ের নির্দেশে নিউ দিল্লী আস্‌তেই, আমি মাসিক অন্ততঃ চারশো টাকা উপার্জনের সন্ধান পেলাম। আরও একটা শুভ লক্ষণ দেখা গেল। কয়েকদিন বাদে, যে দিন আমার A. M. I. E. ক্লাস খোলার কথা খবরের কাগজে প্রথম বিজ্ঞাপিত হ'ল, সেই দিনই আমার প্রাক্তন সিন্ধী ছাত্র (যে সিন্ধু-প্রদেশে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল আমার প্রধান সহকারীর পদে কাজ ক'রেছিল), কৃপালদাস সৈনানি, আমার সঙ্গে দেখা ক'রে, আবার আমার প্রধান সহকারী-হিসাবে, আমার নিউ দিল্লীর কলেজের কাজে যোগদান করে। প্রধানতঃ, এই অক্লান্তকর্মা সহকর্মীর উদ্যম, অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ ব্যবসা-বুদ্ধির জন্য, আমার নিউ দিল্লীর কলেজের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি হয়, এবং আমারও অর্থের অনটন দূরীভূত হয়। মায়ের কৃপায় ঐ A. M. I. E.

ক্লাসের আয় থেকে আমার ও সৈনানির স্বচ্ছন্দ জীবিকা অনেক বৎসর যাবৎ নির্বাহ হয়েছে।

১৯৬৫ সালের অক্টোবরে ৺দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর দিন, সকাল প্রায় ১১টার সময়ে ক'লকাতায় কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছেই, একটা আসন্ন মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে মায়েরই কৃপায় কি-ভাবে বেঁচে গিয়েছিলাম, তার বিবরণ দিয়ে এই অধ্যায় শেষ ক'রবো। এর প্রায় তিন মাস আগে, ১১ই জুলাই তারিখে, প্রয়োজনীয় পূজাদি সম্পন্ন ক'রিয়ে, মা, কল্যাণীতে আমাদের সদ্যনির্মিত বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়ে আমাদের গৃহ-প্রবেশ ক'রিয়েছিলেন। আমি ক'লকাতায় থাক্‌তে, ৺দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর দিন সকালে খবর পেলাম যে, কল্যাণীতে আমাদের গৃহভৃত্যের কাপড়-জামা সব চুরি হ'য়ে গিয়েছে। তারই জন্য কিছু জামা-কাপড় কেনার উদ্দেশ্যে, আমি কালিঘাট ট্রাম ডিপোর সন্নিহিত কালী-কাট্‌রায় যাই। সেখানে একটা দোকানে ধুতি কিনি। পরে, গেঞ্জি প্রভৃতি কেনার জন্য ট্রাম-রাস্তার অপর পারে "হকার্স কর্ণার্"-এ যখন যাবার উদ্যোগ করি, তখন রাস্তায় ভিড় ছিল না। কতকটা অন্যমনস্ক-ভাবে আমি যখন প্রথম ট্রাম-লাইনটার মাঝখানে পৌঁছেচি, তখন হঠাৎ আমার চশমার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই, কি যেন আমার দিকে দ্রুত এগিয়ে আস্‌ছে। সেখানেই দাঁড়িয়ে, মুখ ফিরিয়ে দেখলাম,—একটা ট্রাম-গাড়ী প্রবল বেগে আমার দিকে এগোচ্ছে। ট্রামটা তখনই আমার এত কাছে এসে প'ড়েছে যে, আমি কিছু ভাব্‌বার বা

পালাবারও সময় পেলাম না। ট্রামটা যখন একেবারে কাছে এসে গেল, automatically (স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো) আমি যেন থামাবার চেষ্টায়—আমার ডান হাত এগিয়ে দিয়ে ট্রামের সাম্‌নেটা স্পর্শ ক'রলাম। সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত ট্রামের প্রবল ধাক্কায় আমি ছিট্‌কে প'ড়লাম। কিন্তু, প'ড়লাম সেই লাইনের মাঝখানে, তিন-চার হাত দূরে। আমি ছু'-পা' সাম্‌নে-ছড়ানো-ভাবে ঐ দ্রুত ধাবমান ট্রামের দিকে মুখ ক'রেই ব'সে প'ড়েছিলাম। আমার বাঁ-হাত মাটিতে ঠেকানো ছিল; ডান-হাতে কাপড়ের প্যাকেট্‌টা ধরা ছিল। সাম্‌নে তিন-চার হাত খালি জায়গা পাওয়াতে, ট্রামের সতর্ক ড্রাইভার—প্রাণপণে ব্রেকের হাতল ঘুরিয়ে ট্রামটা থামাবার প্রবল চেষ্টা ক'রলো। আমিও—কতকটা ইচ্ছা-শক্তি-প্রয়োগের ভাবে, মনে-মনে ব'লছিলাম,—'ট্রাম আমাকে ছোঁবে না'। সত্যিই, আমার ছড়ানো পা-ছুটার ছু'-ইঞ্চি মাত্র ব্যবধানে, ট্রামটা অতিদ্রুত তার প্রচণ্ড গতি হারিয়ে, নিশ্চল হ'ল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল ছু'-তিন সেকেণ্ডের মধ্যে। এর মধ্যে আমি মা-কেও স্মরণ ক'রতে পারি নি। ট্রামটা থাম্‌লে, তবে আমি সমস্ত ব্যাপারটা—কি ঘ'টছিল, এবং কি সাংঘাতিক দুর্ঘটনা হ'তে পারতো—চকিতে সম্যক্ ভাবে বুঝলাম। তখন, আমার ছড়ানো পা'-ছুটো গুটিয়ে নিয়ে, উঠে দাঁড়িয়ে, মা-কে মনে-মনে প্রণাম ক'রে, একটু হেসে, উপরের দিকে হাত তুলে ইসারা ক'রে (তখন কিছুক্ষণ আমার মুখ দিয়ে কথা স'রছিল না) ট্রামের ড্রাইভারকে

বল্‌লাম,—ভগবানের কৃপায় তুমি ও আমি রক্ষা পেলাম। ঐ ট্রামে-চাপা-পড়ার আসন্ন দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাবার সমস্ত কৃতিত্ব তো মায়েরই। কারণ, ঐ সময়ে আমার শার্টের বুক-পকেটে ছিল—মায়েরই একটা ছোট ফটো—একটা নোট-বুকের মলাটে আঠা দিয়ে আট্‌কানো। ঐ ছবিতে অধিষ্ঠিতা মা-ই তো সেদিন আমাকে—তাঁর সাহায্য না-চাইতেই —অলক্ষ্যে থেকে—রক্ষা ক'রেছিলেন। বাড়ীর বাইরে যেতে হ'লেই ঐ নোট-বুক আমি শার্টের বুক-পকেটে পুরে নিই। ঐটাই আমার অব্যর্থ রক্ষা-কবচ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সন্তান-শোধনে মা

মায়ের একটা হাল্‌কা (অথচ গূঢ়-তাৎপর্যপূর্ণ) লীলা-কথা দিয়ে এই অধ্যায় আরম্ভ ক'রবো।

একদিন (সন ও তারিখ সঠিক মনে নেই) তুপুরের পরে, মা যখন বালিগঞ্জের বির্লা-মন্দিরে, মন্দির-সংলগ্ন ঘরে, ভোগের পরে বিশ্রাম ক'রছিলেন, আমি মায়ের দর্শনের জন্য ঐ মন্দিরে এসে, মায়ের ঘরের বারান্দায়—সেখানে একটা তক্তাপোষ পাতা ছিল, এবং আমিও কিছুটা অসুস্থ ও ক্লান্ত ছিলাম—তক্তাপোষের উপরে শুয়েছিলাম। আমার শিয়রের কাছে একটা জলপূর্ণ পিতলের ঘটি ছিল, এবং তার আশে-পাশে কিছু জলও ছড়ানো ছিল। মা-কে হঠাৎ ঘর থেকে বেরুতে দেখে, আমি ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মা, আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে, ছড়ানো জল দেখিয়ে রহস্য ক'রে আমাকে প্রশ্ন ক'রলেন,—বাবা, এ কি জল? না, তুমি মুতেছ? আমার মুখ দিয়ে ঐ প্রশ্নের অবান্তর উত্তর বেরুলো,—মা, হাগ্‌তে-মুত্‌তে তো আমরা, পরিষ্কার ক'রতে হবে তো, তোমাকে। মা ধীরে ধীরে পায়চারি ক'রছিলেন। একটু পরে ব'ললেন,—তা' বাবা, যদি তেমন ক'রে ব'ল্‌তে পার, তা'হলে পরিষ্কার তো ক'রতেই হবে। মায়ের কথায় বুঝলাম যে, পরম নির্ভরতার সঙ্গে তাঁর চরণ আশ্রয় ক'রতে পারলে,

তিনি আমাদের অন্তরের সব আবিলতা দূর ক'রে তাঁর দিব্য অঙ্কে স্থান দেবেন। এই আশ্বাস-বাণীই তো কৃষ্ণ অর্জুনকে শুনিয়েছিলেন,—'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি' (আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত ক'রবো)।

আমার চরিত্রে একটা বড় রকমের দোষ ছিল—প্রহার-পরায়ণতা। আমি সামান্য কারণে, বা বিনা কারণে, লোককে আঘাত ক'রে ব'সতাম। কি-রকম সুকৌশলে, তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনা (master plan) ঘুণাক্ষরেও আমাকে না জানিয়ে, মা আমার ঐ দৃঢ়মূল দোষ দূর করার অব্যর্থ চেষ্টা ক'রলেন, সমগ্র পটভূমিকা সমেত তার পূর্ণ বিবরণ দিচ্ছি।

আসল যে ঘটনার মাধ্যমে আমার ব্যাপারে মায়ের এই শোধন-লীলা প্রকটিত হ'ল, সেটা ঘ'টেছিল ১৯৪০ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে। ঐ দিনটা ছিল রবিবার। মা, ঐ সময়ে, স্বাস্থ্যের কারণে, প্রায় দু'মাস ছিলেন—আগরপাড়ায় গঙ্গার ধারে গিরিবালার কালীবাড়ীতে (*)। আমি ও আমার ভাই বীরেন প্রতি রবিবার এখানে এসে কয়েক ঘণ্টা মাতৃসঙ্গে কাটিয়ে যেতাম। কোনও কোনও রবিবারে, সুবিধা হ'লে, সন্ধ্যাতেও আর একবার আস্‌তাম।

---

* এই কালীবাড়ীতে আছে—দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর মতোই দ্বাদশ শিব-মন্দির, কালীমন্দির ও রাধাকৃষ্ণের মন্দির। কালী-মন্দিরের সঙ্গে আছে, সুন্দর শ্বেত-পাথর-বাঁধানো ছোট নাট-মন্দির। কালীবাড়ীর সীমানার মধ্যে, একেবারে গঙ্গার উপরে, ৩।৪ খানা সুন্দর ঘর আছে। এই ঘরগুলিতে মা ও সঙ্গীয় ভক্তরা ছিলেন। দিদিমা ও গুরুপ্রিয়া দিদিও মায়ের সঙ্গে ছিলেন। আমাদের বর্তমান আগরপাড়া আশ্রম ঐ গিরিবালার কালীবাড়ীর সন্নিকটে।

ঐ তারিখের ৫।৬ মাস আগে, আমি একদিন ক'লকাতায় একটা টেলিগ্রাম পেলাম, অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর কাছ থেকে : Mother wants you come Dacca immediately. টেলিগ্রাম পেয়েই, ৫।৬ দিনের ছুটি নিয়ে আমি ঢাকায় যাই। ঢাকায় রম্‌না আশ্রমে ৩।৪ দিন আনন্দে কাটালাম। কিন্তু এ-কয়দিনে, মা যে কেন আমাকে টেলিগ্রাম-যোগে ঢাকায় ডেকেছেন, তার কোনও আভাস পেলাম না। এ-কয়দিনের মধ্যে মায়ের সঙ্গে আমার কোন কথাও হয় নি। আমার ছুটি-কাল যখন উত্তীর্ণপ্রায়, আমি মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে প্রশ্ন ক'রলাম,—মা, আমি কাল যাই ? মা ব'ললেন,—আমি পরশু এখান থেকে যাবো, তুমি আমার সঙ্গেই যেয়ো। ঐ কথানুযায়ী আমি মায়ের দলের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টীমারে রওনা হ'লাম। স্টীমারটা মুন্সীগঞ্জে পৌঁছে, কেন জানি না, কয়েক ঘণ্টা থেমেছিল। মায়ের সঙ্গে আমরা সব মুন্সীগঞ্জে নেমে, কয়েকটা নৌকায় চ'ড়ে চ'ললাম বীরেন-দা'র(*) বাড়ীতে। মায়ের নিজস্ব বিশেষ ব্যবস্থায়, শুধু বীরেন-দা' ও আমি মায়ের সঙ্গে একই নৌকায় ছিলাম। তখন বর্ষাকাল। ওপার-বাংলা সম্পূর্ণ জলমগ্ন। আমাদের নৌকাখানা মায়েরই নির্দেশে, একটা জল-নিমগ্ন খেজুর-গাছের উপরিভাগে বাঁধা

* ইনি অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর জ্যেষ্ঠপুত্র বীরেন মুখোপাধ্যায়, গুরুপ্রিয়া দিদির দাদা। তখন মুন্সীগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। বীরেন-দা' ছিলেন অগাধ পণ্ডিত, মায়ের একান্ত ভক্ত, এবং ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় কুশলী সুবক্তা। ইনি মায়ের অলৌকিক লীলা-কাহিনী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে সাবলীল ও মনোজ্ঞভাবে ব'লে যেতে পারতেন। ইনি এখন পরলোকে।

হ'ল। সেই গতিহীন নৌকায় ব'সে, মা—আমাদের দুজনের কাছে—অভয় ও আরও একজন ব্রহ্মচারীর আচরণ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ ক'রলেন। তা'রা মায়ের নিজের প্রতি এবং মায়ের ভক্তদের প্রতি—কি-রকম সব অশালীন ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ক'রেছে—তা অনর্গলভাবে ব'লে যেতে লাগলেন। মায়ের অভিযোগগুলি যখন শুনছিলাম, তখন অবাক্ হয়ে, মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আমি ভাবছিলাম যে,—এই মহিলা যদি ব্যারিষ্টার হ'তেন তা'হলে, আইন-ব্যবসায়ে অদ্বিতীয় হ'তেন। অভিযোগগুলির অধিকাংশ আমি ভুলে গিয়েছি। তবে, স্পষ্ট মনে আছে,—'দু'টো দানব জুটেছে' এই কথা দিয়ে মা ঐ অভিযোগগুলির সূচনা ক'রেছিলেন। ঐরকম গালি-সূচক নিন্দার ভাষা মায়ের মুখ থেকে আর কখনও শুনিনি। অভয় যে মায়ের আদেশ মান্‌তো না, এমন-কি রেগে গিয়ে মায়ের গায়ে হাত-ও তুলতো, তা' তো স্বচক্ষেই দেখেছি। এ কথাও আমার কানে এসেছিল যে,—অভয় একসময়ে আবদার ধরেছিল যে,—সে প্রত্যহ এক ঘণ্টা ক'রে মায়ের সঙ্গে 'প্রাইভেট্' করবে এবং বেশ কিছুদিন মা তার এই অতি-অসঙ্গত আবদার পূরণও ক'রেছিলেন।

মায়ের মুখে ঐসব অভিযোগ শুনে, আমি ভাবলাম,—মা কেন বেছে বেছে শুধু আমাদের দু'জনকে এসব কথা জানালেন? অথচ, মা বেশ জানেন যে, আমরা দু'জনই অতি-ক্রোধী ও প্রহার-পরায়ণ। ভেবেচিন্তে আমি সিদ্ধান্ত ক'রলাম যে, মা চাইছেন আমরা যেন ঐ 'দু'টো

দানব'-এর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করি।

মায়ের সঙ্গে নৌকা-যোগে আমরা সব বীরেন-দা'র বাড়ী পৌঁছুলাম। সেখানে, আমি তখনই আবার মুন্সীগঞ্জের স্টীমার-ঘাটে স্টীমার ধ'রে গোয়ালন্দে যাবো ব'লে, তাড়াতাড়ি আহার সেরে নিলাম। যখন মা-কে প্রণাম ক'রে বিদায় নিচ্ছি, মা আমার কানের কাছে মুখ এনে' চুপি চুপি বললেন, —এসব কথা মা-কে (অর্থাৎ ছবির-মাকে) ব'লো না, অনর্থক মনে কষ্ট পাবে। আমি মায়ের ঐসব অভিযোগের কথা কাউকেই জানাই নি।

এর আগে, আমি একবার বিন্ধ্যাচল আশ্রমে, অভয়ের আপত্তিকর আচরণ দেখে, মা-কে বলেছিলাম,—মা, তুমি তো শুধু দৃষ্টি দ্বারা অভয়কে যথেষ্ট শাসন ক'রতে পারো, তা' কর না কেন ? তার উত্তরে স্নেহময়ী মা ব'লেছিলেন,—ওর আত্ম-হত্যা যোগ আছে ; সেটা না কাট্‌লে, ওর বিরুদ্ধে কোন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া ঠিক হবে না।

যাই হোক্, কলকাতায় ফিরে এসে, মায়ের অভিযোগগুলির কথা ভেবে আমি সুযোগ খুঁজতে লাগ্‌লাম এবং সুবিধে পেলেই একদিন অভয়কে 'উত্তম-মধ্যম' দেবো—এই সংকল্প ক'রলাম। সেই সুযোগ উপস্থিত হ'ল আগরপাড়ার গিরিবালার কালী-বাড়ীর নাট-মন্দিরে, উপরোক্ত রবিবারে।

ঐ দিন, শীতের প্রাতে, মা এসে ব'সেছিলেন—নাট-মন্দিরের একদিকে একখানা ইজি-চেয়ারে। মায়ের মাথা ও

শরীর ছায়াতে ছিল। শুধু পা-ছুখানিতে রোদ্দুর প'ড়ছিল। আমি মায়ের সামনে খুব কাছেই ব'সেছিলাম এমনভাবে, যা'তে আমার মাথার ছায়াটা মায়ের চরণ স্পর্শ করে। ঐ সময়ের কিছু আগে নিয়ম হ'য়েছিল—কেউ মায়ের চরণ স্পর্শ ক'রবে না। তাই, ঐ ভাবে বসায়, আমার মাথার ছায়াটা যখন মায়ের চরণ স্পর্শ ক'রলো, আমি মনে খুব আনন্দ পেলাম। আমার অদূরে ছায়াতে যতীশ-দা' (৮ পৃষ্ঠা) ব'সেছিলেন। আমার কেশ-বিহীন মাথায় রোদ্দুর লাগ্‌ছে দেখে, যতীশ-দা' আমাকে ব'ললেন,—নরেন ভায়া, তোমার মাথায় রোদ্দুর লাগ্‌ছে ; একটু স'রে ব'সো। তা'তে আমি ব'লেছিলাম,—তোমরা তো আজকাল মায়ের পা' ছুঁতে দাও না। আজ আমার মাথার ছায়াটা মায়ের চরণ স্পর্শ ক'রছে, এও কি তোমাদের অসহ্য হচ্ছে? আমি অবশ্য নিজের ঐ যত্ন-লব্ধ জায়গা ছেড়ে যাই নি।

সেদিন ঐ নাটমন্দিরে, মায়ের উপস্থিতিতে, বেশ একটা সুন্দর, শান্ত, শ্রদ্ধা-ভক্তির শুদ্ধ আব্‌হাওয়া হ'য়েছিল। আমরা সব চুপ্‌চাপ্‌ মায়ের দিকে চেয়ে একটা দিব্য আনন্দ উপভোগ ক'রছিলাম। আমার একটু অদূরে, ছায়ায় ব'সে, অভয় শ্রীমদ্‌-ভাগবত বা অন্য কি বই খুলে কি-যেন পাঠ ও ব্যাখ্যা ক'রছিল। হঠাৎ সে অবান্তর মন্তব্য ক'রলো,—ভোলানাথ মিথ্যাবাদী ছিলেন। এই মন্তব্য শুনে, আমি অভয়কে এই ব'লে সাবধান ক'রলাম,—শোন অভয়, ভোলানাথ আমার গুরু, তাঁর কোনও নিন্দে আমি সহ্য ক'রবো না। তুমি আবার যদি তাঁর নিন্দে

কর, আমি তোমাকে মারবো। অভয় তো ভীষণ অসহিষ্ণু ও জেদী ছিল। আমার সাবধান-বাণী উপেক্ষা ক'রে সে পুনরায় ভোলানাথের নিন্দে ক'রলো। তখন আমি প্রায়-ক্ষিপ্ত হ'য়ে, অভয়কে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে, আমার জায়গায় উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু অতিরিক্ত ক্রোধের জন্য আমার শরীর এতো স্ফীত হ'ল যে, আমার কোমরের কাপড় হঠাৎ খ'সে প'ড়লো। (অবশ্য আমি ধুতির নীচে ছোট পা-জামা প'রতাম ব'লে, আবরণ-হীন হইনি)। আমিও তখন অতি-মাত্রায় অপ্রতিভ হ'য়ে নিজের জায়গায় ব'সে প'ড়লাম। এর পরে, আরও একবার অভয় সেই আপত্তিকর মন্তব্য উচ্চারণ ক'রলো। তখন আমি, ধুতি সাবধানে সাম্‌লিয়ে নিয়ে, ভালো ক'রে কোমর বেঁধে, আবার উদ্যত হ'লাম অভয়কে আক্রমণ ক'রতে। কিন্তু, আমার পিছনেই আমার ছোট ভাই বীরেন ব'সে ছিল। বীরেন ছিল আমার চেয়ে চোদ্দ বৎসর ছোট, এবং যথেষ্ট বলিষ্ঠ। সে দেখ্‌লো যে আমি ক্ষেপে গিয়েছি, এবং রাগের মাথায়, হয়তো, অভয়কে খুন ক'রে ফেল্‌বো। তাই, সে এমন জোরে আমার কোমর জড়িয়ে ধ'রলো যে, আমি একটুও ন'ড়তে পারলাম না। মা সবই দেখছিলেন এবং শুনছিলেন। আমিও অভয়কে সাবধান করার সঙ্গে সঙ্গে বার বার মায়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। যদি মা একটুও চোখের বা হাতের ইসারা ক'রে আমাকে সংযত হ'তে নির্দেশ দিতেন, আমি তখনই সংযত হ'তাম। কিন্তু মা রইলেন —কাঠের পুতুলের মতো নির্বাক, নিশ্চল, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

আমার উগ্রমূর্তি দেখে, ভয় পেয়ে, অভয় দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল মায়ের ইজি-চেয়ারের পিছনে।

এর পরে, কিছুক্ষণ ঐ নাটমন্দিরের আব্‌হাওয়ায় ছিল একটা থম্‌থমে, গুমট, স্তব্ধ ভাব। দুঃসহ নীরবতা ভঙ্গ ক'রে মা-ই প্রথমে আমাকে প্রশ্ন ক'রলেন,—বাবা, তোমার খুব রাগ হ'য়েছিল? আমি ব'ললাম,—হ্যাঁ মা, আমার খুব রাগ হ'য়েছিল। তা'তে মা আবার প্রশ্ন ক'রলেন,—তুমি অভয়কে মারতে চেয়েছিলে? আমি উত্তর ক'রলাম,—হ্যাঁ, মা। তার পরে, যে লীলা ক'রে আমার মারাত্মক দোষ দূরীভূত করার অব্যর্থ প্রয়াস ক'রলেন, তা' অপূর্ব, অচিন্তনীয়। মা আমাকে ব'ললেন,—ওর বদলে তুমি আমাকে মারো। ব'লেই, নিজের বাঁ হাতখানা চিৎ ক'রে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি মায়ের ঐ হাতখানা নিজের দুই হাতের মধ্যে ধ'রে হতবুদ্ধি হ'য়ে ব'সে রইলাম। কিন্তু, যখন মা 'মারো', 'মারো', 'মারো', ব'লে তিনবার আমাকে মারতে আদেশ ক'রলেন, তখন প্রায়-নির্জীব একটা অচেতন যন্ত্রের মতো, আমি মায়ের ঐ আদেশ পালন ক'রতে প্রস্তুত হ'লাম। আমার বাঁ-হাতের উপর মায়ের হাত ছিল, তার উপরে ছিল আমার ডান-হাত, উপুড়-করা। ডান-হাতটা একটু উপরে তুলে, মায়ের বাঁ-হাতের উপরে মৃদু আঘাত ক'রে, আমি ব'ল্‌লাম,—এই মারলাম। তখন মা ব'ললেন,—আরো জোরে মারো। আমি এবারে আমার ডান হাত-খানা আরও একটু উঁচু ক'রে তুলে, আরও একটু জোরে

মায়ের বাঁ-হাতের উপর দ্বিতীয়বার আঘাত ক'রে বল্‌লাম,—এই মারলাম। আরও একবার মা আদেশ ক'রলেন,—আরও জোরে মারো। তাই, এবারে ডান হাতখানা আরও উঁচু ক'রে তুলে,আরও জোরে মায়ের বাঁ-হাতের উপর আঘাত ক'রে ব'ললাম,—এই মারলাম। এর পরে, তখনও মায়ের বাঁ-হাত আমার ছু'-হাতের মধ্যে ধরা ছিল,—মা বল্‌লেন,—বাবা, তোমার হাতে আমার হাত ধরা আছে। এইভাবে, তুমি প্রতিজ্ঞা করো,—আর কখনও কাউকে মারবে না। আমি ব'ল্‌লাম,—মা, তোমার গা ছুঁয়ে এরকম প্রতিজ্ঞা তুমি আমাকে ক'রতে ব'লো না, আমি ও-প্রতিজ্ঞা ক'রবো না। তখন মা ব'ল্‌লেন,—আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা কর যে,—না-মারবার চেষ্টা ক'রবে। আমি তখন ঐ ভাবে মায়ের শরীর স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লাম,—না-মারতে চেষ্টা ক'রবো।

পঞ্চম অধ্যায়ে ব'লেছি (৬১ পৃষ্ঠা) যে, ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে ক্যাল্‌কাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে একটা দাঙ্গায় আমার ছুটো দাঁত ভেঙ্গে যায়। ঐ বছরের অক্টোবর মাসে, আমি হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে ডাক্তার পীতাম্বর পান্থের পীতকুঠীতে মা-কে দর্শন করি। দাঙ্গার বিবরণ সব শুনে' মা আমাকে বলেছিলেন,—বাবা, ছু'টো দাঁত তো গেছে, আর মারপিট ক'রো না। আমি তা'তে সদর্পে ব'লেছিলাম,—মা, এখনও ত্রিশটা দাঁত আছে, অনেক লড়াই ক'রতে পারবো। তখনই মা বুঝেছিলেন যে, দাঙ্গা-প্রবণতা আমার সংস্কার-জাত ছুরারোগ্য ব্যাধি।

তাই, প্রথমে আমাকে অভয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে, পরে আমার অভয়কে প্রহার করার দু'-বার বিফল চেষ্টা নিজের সাম্‌নে সংঘঠন করিয়ে; শেষ পর্যন্ত আমাকে দিয়ে তাঁর নিজের শরীরে আঘাত করিয়ে, আমার ঐ মজ্জাগত ব্যাধি, আমারই কল্যাণের জন্য, ঐরূপ painless operation (যন্ত্রণা-বিহীন শল্য-চিকিৎসা) ক'রে নিরাময় ক'রলেন।

আমার প্রহার-প্রবণতা-ব্যাধি কতদূর সেরেছে তার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম—১৯৪৬ সালের মে মাসে। বালিগঞ্জে একডালিয়া রোডের আশ্রমে অনুষ্ঠিত মায়ের জন্মোৎসবের মধ্যে। ঐ উৎসবের আমি ছিলাম সেক্রেটারি। একদিন সন্ধ্যার পরে সন্নিহিত প্যাণ্ডেলে 'নদের নিমাই' অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। সে দিনটা গুমট্-গরম ছিল। প্যাণ্ডেলে এত ভিড় হ'লো যে, আর-একটা লোকও প্যাণ্ডেলে ঢোকানো যায় না। এমন সময়ে, ঐ পাড়ারই ৪।৫ জন বলিষ্ঠ তরুণ জোর ক'রে প্যাণ্ডেলে ঢুকতে গেলে, আমি তাদের ঠেলে বা'র ক'রে দিই। ভিড় বেশী ছিল ব'লে, আমি নিজেও প্যাণ্ডালে, প্রবেশ করি নি। অভিনয় আরম্ভ হ'লে, আমি বাড়ী ফিরবার উদ্যোগ ক'রলাম। ঐ বিতাড়িত ও বিক্ষুব্ধ তরুণের দল গলির মোড়ে আমার পথরোধ করলো। তারা আমাকে প্রশ্ন ক'রলো,—আপনি কেন আমাদের ঠেলে বা'র ক'রে দিয়েছেন? আমি তাদের বুঝাবার চেষ্টা করলাম যে, —ভিড় অত্যন্ত বেশি হ'য়েছে। ঐ ভিড়ে তোমরা প্যাণ্ডেলের ভিতর ঢুকলে তোমাদেরও কষ্ট হ'তো, আর যা'রা আগে

ঢুকেছে, তাদেরও কষ্ট বাড়তো। তা'রা আমার কথা বুঝতে চাইলো না। বরং তা'রা ব'ল্‌লো,—আপনাকে মারবো। আমার আগেকার প্রহার-প্রবণতা অব্যাহত থাক্‌লে, তখনই একটা মারপিট আরম্ভ হ'তো। কিন্তু আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, আমি কিছুতেই হাত তুল্‌বো না। আমি তাদের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে, মাথাটা নীচু ক'রে ব'ললাম,—বেশ তো, মারবে ব'লেছিলে, মারো। তখন তাদের মধ্যে ২।১ জন ব'ল্‌লো,—উনি গান্ধী হ'য়েছেন, তাই বলছেন,—'মারো'। আমি ব'ল্‌লাম,—আমি গান্ধী হইনি। তোমরা মারতে চেয়েছিল, তাই বলছি, 'মারো'। তা'রা তখন বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে কি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আস্তে আস্তে চ'লে গেল। আমিও মা-কে স্মরণ ক'রতে ক'রতে, বেরিয়ে গিয়ে, ট্রামে চ'ড়ে বাড়ী ফিরলাম। সেদিন যদি আগেকার গোঁয়ার্তুমি ক'রে, আমি ওদের মারতে যেতাম—আমার বয়স তখন ৫২ বৎসর—তা' হ'লে অতগুলি বলিষ্ঠ তরুণের হাতে প্রচণ্ড মার খেতাম। কৃপাময়ী মা তা' হ'তে দেবেন কেন? তাই, আমারই কল্যাণের জন্য, আগে থেকে আমার প্রহার-প্রবণতা দূর ক'রে, এবং আমাকে সুবুদ্ধি দিয়ে ও সংযত ক'রে, বাঁচিয়ে দিলেন (*)।

সাধন-পথে অহংকার একটা প্রধান অন্তরায়। আমার দু'টো বিষয়ে খুব অহংকার ছিল। প্রথমতঃ, আমি মনে

* এই প্রসঙ্গে, ৬৪—৬৬ পৃষ্ঠায় বিবৃত ঘটনা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

ক'রতাম যে,—আমি খুব দানশীল। একদিন ছবির-মা কাশীতে মায়ের কাছে অনুযোগ করেন,—মা, আমরা তো ক'লকাতায় ভাড়া-বাড়ীতে থাকি। তোমার ছেলে (অর্থাৎ আমি) কিছুই সঞ্চয় করেন না। বহু টাকা দান ক'রে উড়িয়ে দেন। ওঁর উপার্জন না থাকলে, আমাকে তো রাস্তায় দাঁড়াতে হ'বে। তুমি ওঁকে আদেশ কর—যেন অত দান না ক'রে একটা বাড়ী করার চেষ্টা করেন। মা আমার কাছে জান্‌তে চান,—আমি মাসে মাসে কত কত টাকা কা'কে কা'কে দিই। মায়ের সাম্‌নে মুখোমুখি হিসেব ক'রে দেখা গেল যে, আমার মাসিক দানের পরিমাণ, ৪০০-৫০০ টাকা। মা আমাকে ব'ল্‌লেন, বাবা, একটা বাড়ী করার চেষ্টা কর। আমি ব'ললাম,—মা, আমার তো টাকা নেই। তোমার কৃপায় যদি টাকা হয়, তা' হ'লে বাড়ী হবে। মা আরও ব'ল্‌লেন, দান ক'রতে তোমাকে বারণ ক'রবো না। কিন্তু, গৃহস্থের পক্ষে অতো দান করা ভাল নয়। গৃহস্থকে সঞ্চয় ক'রতেই হয়। এর পরে আরও একদিন আগরপাড়া আশ্রমে একটু জোর ক'রেই মা ব'লেছিলেন,—বাবা, দান কমাও। জগতে অভাব-দুঃখ কি কম আছে? তোমার কতটুকু ক্ষমতা? কিন্তু, মা এতো ক'রে বলাতেও আমার বাস্তব-বুদ্ধি এলো না। আমার অবস্থার-অতিরিক্ত-দান-করার নেশা বা অহংকার ক'মলো না, যদিও মনে-মনে, দানের পরিমাণ ক'মিয়ে, মায়ের নির্দেশ পালন করার ইচ্ছাও বলবৎ ছিল। শেষে আমার এক চরম দুর্বুদ্ধি হ'ল। আমি,

ফলাফল না বুঝে', মা-কে প্রার্থনা জানালাম,—মা, যদি তুমি চাও, আমি দান করার পরিমাণ কম ক'রবো, বেশ তো, আমার আয় কমিয়ে দাও, তা'হলে দানও ক'মে যাবে। আমার ঐ দাম্ভিক ও অবোধ প্রার্থনাও পূর্ণ ক'রে মা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, —অতিরিক্ত দান-করার মতো, ঐ ধরনের হঠকারী প্রার্থনাও গৃহস্থের পক্ষে চরম অশুভকর ও অত্যন্ত গর্হিত।

এ ছাড়া, আমার আরও একটা অহংকার ছিল যে,—ছাত্রদের উপযোগী বই-লেখার কাজে আমি ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই অহংকারের একটা কারণও ছিল। ১৯৬৫ সালে—মায়েরই কৃপায়—নিউ দিল্লীর একটা প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশন-সংস্থা—আমার অবিক্রীত সমস্ত বই—উচ্চ কমিশনে কিনে—আমাকে অনেক টাকা দেয়। আমার মনে হ'ল,—আমি বই লিখে, নিজে ছাপালে, বই সব হু-হু ক'রে বিক্রী হয়ে যাবে এবং আমারও প্রচুর আয় হবে। এই ভেবে, ৩।৪ বৎসর প্রচুর পরিশ্রম ক'রে আমি দু'খানা ছাত্রদের উপযোগী গণিতের বই ছাপাই ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে। কিন্তু বই দু'খানা আদৌ ভাল বিক্রী হয় নি। অবশ্য বই বিক্রী না হওয়ার একটা প্রধান কারণ ছিল,—দেশের সর্বত্র শিক্ষার মানের অবনমন। বই আশানুরূপ বিক্রী না হওয়ায় এবং বই ছাপাতে অনেক ব্যয় হওয়ায়, আমি ঋণগ্রস্ত হ'লাম। তবে, যখন আমার উপার্জন বেশী ছিল, তখন সংসার-খরচ সবই আমি নিজে নির্বাহ ক'রতাম। সেই সুযোগে, আমার দুই উপার্জনক্ষম কন্যা, বেশ কিছু সঞ্চয় ক'রতে পেরেছিল ব'লে, কল্যাণীতে আমি

যে এক প্লট্ জমি কিনেছিলাম, তার উপরে তা'রা একটা দু'-তলা বাড়ী তৈরি করতে পেরেছিল। মায়ের সদিচ্ছায় প্রাপ্ত কল্যাণীর এই বাড়ীতেই উপস্থিত হ'য়ে মা আমাদের গৃহ-প্রবেশ ক'রিয়েছিলেন—১৯৬৫ সালের ১১ই জুলাই তারিখে। আজ, মায়ের সদা-কল্যাণকর কুশলী ব্যবস্থায় আমার দান করার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি, তথা দানের ও অর্থের অহংকার অন্তর্হিত। আমার ছাত্রদের উপযোগী বই-লেখার পারদর্শিতার অহংকারও তিরোহিত। নানাপ্রকার বিচিত্র কৌশলে, কৃপা ক'রে মা আমার চরিত্রের প্রধান দোষগুলি একে একে দূর ক'রে, আমাকে বহুলাংশে শোধন ক'রেছেন।

এইবার, দয়াময়ী মা অভয়কে কি-ভাবে শোধন ক'রেছেন এবং এখনও ক'রছেন, তার সংক্ষেপিত একটা বিবরণ দিয়ে, এই অধ্যায় শেষ ক'রবো। অভয়ের অনেক গুণ ছিল। গানের সুর ও তাল সম্বন্ধে তার গভীর সহজাত জ্ঞান ছিল। মূল-গায়ক হ'য়ে পরিচালনা ক'রে সে যে-কোনও নাম-কীর্তন অনায়াসে জমিয়ে দিতে পারতো। তাই, দিল্লীর ভক্তদের সকলেরই সে খুব প্রিয় ছিল। এক ভাইজী ছাড়া, মায়ের আর কোনও পুরুষ-ভক্ত অভয়ের মতো এতো দীর্ঘকাল এবং এতো ঘনিষ্ঠভাবে মায়ের সঙ্গ করার সুযোগ পায় নি। তার চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল প্রচণ্ড অহংকার এবং তজ্জনিত অসহনশীলতা, অশিষ্টাচার ও ক্রোধ। আর সব অহংকারের মধ্যে তার ব্রহ্ম-চর্যের অহংকার ছিল সবচেয়ে প্রকট। এই অহংকারের দাপটে, সে তার চেয়ে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ও সমাজে জ্ঞানী-গুণী-মানী

ব'লে স্বীকৃত মায়ের গৃহস্থ ভক্তদের অবলীলাক্রমে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অপমানিত ক'রতো। এমন-কি মায়ের কল্যাণকর আদেশ-গুলিও পালন ক'রতে চাইতো না। যথাসময়ে, অভয়ের আত্মহত্যা-যোগের ফাঁড়া (৮২ পৃষ্ঠা) কেটে গেলে, অভয়ের মত জেনে, মা উদ্যোগ ক'রে, আশ্রমের একটি মেয়ের সঙ্গে (*) অভয়ের বিয়ে দিয়ে, তার একটা বড় অহংকারের মূলোচ্ছেদ ক'রে তাকে বেশ কিছুটা শোধন ক'রলেন। এর পরে নানা অবস্থা-বিপর্যয়ের জন্য অভয়ের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। এখনও তার স্ত্রী (নাম 'যমুনা')-কে সরিয়ে নিয়ে, কাশীতে মেয়েদের আশ্রমে রেখে, এবং অন্য আশ্রমে অভয়কে আশ্রয় দিয়ে, এবং তার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা ক'রে কৃপাময়ী মা অভয়ের শোধন-কার্য সমাধা ক'রছেন।

কত জায়গায় কত বিভিন্ন কৌশলে তাঁর অগণিত পুরুষ ও স্ত্রী ভক্তকে দোষমুক্ত ও পরিশুদ্ধ ক'রে, মা তাদের নিজ দিব্য অঙ্কে গ্রহণযোগ্য ক'রে নিচ্ছেন, কে তার হিসাব করবে?

---

* এই বিয়ে হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১লা মার্চ তারিখে, বহরমপুরে। এই বিয়েতে মুক্তানন্দ গিরি (দিদিমা) উপস্থিত ছিলেন। মা-ও ঐ দিনে বহরমপুরে অন্য জায়গায় ছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

আরও লীলা-কথা

বিভিন্ন স্থানে, অনেকবার—কখনও আমার কন্যাদের বা পুত্রের সঙ্গে, কখনও বা ছবির-মায়ের সঙ্গে, একবার সকলকে সঙ্গে নিয়ে, কখনও বা একাকী মায়ের কাছে গিয়ে এবং অবস্থান ক'রে তাঁর বহু লীলা দেখার এবং কথা শোনার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে। তার মধ্যে শুধু যেগুলি উল্লেখ-যোগ্য মনে হ'য়েছে এবং এখনও স্পষ্ট মনে আছে, শুধু সেই-গুলিই এই অধ্যায়ে বিবৃত ক'রবো।

(১)

"তাঁদের পা' দেখাতে নেই"

১৯৩৭ সালে জুন মাসে, মায়ের কৈলাস-যাত্রার প্রাক্কালে, আমরা যখন আলমোড়ায় ছিলাম, তখন একদিন মা-কে প্রশ্ন ক'রেছিলাম,—মা, অনেকসময়ে দেখি, তুমি নিজের পা-ছ'খানা সযত্নে তিন-চার পুরু কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখো। তুমি কি চাও না, আমরা তোমার পায়ের দিকে দৃষ্টি করি? মা ব'ললেন,—তা' নয়। তোমরা তো জান না, এ শরীরটাকে দেখ্‌তে অনেক অশরীরী—দেব, দেবী, সাধু, মহাত্মা—আসেন। তাঁদের পা' দেখাতে নেই।

(২)

ভাইজীকে মা কেন বাঁচালেন না

ভাইজীর মহাপ্রয়াণের পরে, আমি একদিন মায়ের কাছে একটু ক্ষোভের সঙ্গেই অনুযোগ ক'রেছিলাম,—মা, ভাইজী তোমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আলমোড়াতে তোমার সাম্‌নেই তিনি দেহত্যাগ ক'রলেন। তুমি তাঁকে বাঁচালে না কেন? মায়ের উত্তর ছিল apologetic (দোষ-স্বীকার-সূচক)। মা বল্‌লেন,—বাবা, কি ক'রে বাঁচাবো? ও ক্রমাগত আমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে,—তোমার সাম্‌নে এইবার যেন আমার মৃত্যু হয়।

(৩)

"পরীক্ষা ক'রো না"

১৯৩৭ সালে ১৯শে আগষ্ট তারিখে, আলমোড়ায় মায়ের সাম্‌নেই ভাইজী ইহলীলা সম্বরণ করেন। ঐ দিনই আলমোড়ার উপকণ্ঠে পাতাল-দেবীতে ভাইজীর মরদেহ সমাহিত হয়। মা সমাধি-স্থান দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সমাধি-স্থান দেখ্‌লে মায়ের শোক (*) দ্বিগুণিত হ'তে পারে, এই আশঙ্কা ক'রে ভোলানাথ মায়ের ভাইজীর সমাধিস্থলে

* মা যে পূর্ণজ্ঞানী এবং শোকের ঊর্ধ্বে, ভোলানাথ তা' বেশ জানতেন। কিন্তু সঙ্কটকালে, সে কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন।

যাওয়ায় বাধা দেন। তা'তে মায়ের অভূতপূর্ব গভীর সমাধি হয়। সম্পূর্ণ অজ্ঞান ও অবশ অবস্থায় মা-কে আলমোড়া থেকে ডেরাডুনে কিষেণপুর আশ্রমে নিয়ে আসা হয়। তিন দিন বাদে, যাওয়ার পথে ট্রেণে মায়ের সমাধি ভাঙ্গে ও মা কথা ব'লতে শুরু করেন। কিন্তু ১৭।১৮ দিন পর্যন্ত মা কোনও খাদ্য গ্রহণ করেন না। সারা দিন-রাত্রে কয়েকবার ২।৪ চামচ ক'রে জল খেতেন। এই দীর্ঘ অনশনের মধ্যে আমি নিউ দিল্লী থেকে আসি মা-কে দর্শন ক'রতে। আমি দেখ্‌লাম যে, মায়ের দেহের উপরের অংশ—মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত—বেশ সুস্থ ও সজাগ, কোমরের নীচের অংশ খুব ঠাণ্ডা ও অসাড়। মা'কে ধ'রে উঠিয়ে বসানো হ'ল। কিন্তু, বসা-অবস্থায় ধরে না-থাক্‌লে, দেহ ঢ'লে পড়ে যায়। ঐ দিন সন্ধ্যার ঠিক আগে, মা শুয়ে ছিলেন এবং আমি একলা মায়ের শিয়রের দিকে ব'সে ছিলাম। দেখলাম, মা দুই হাত ও হাতের আঙ্গুলগুলি নিজে-নিজেই চালনা ক'রছেন। বুঝলাম,—মা নিজেই সুস্থ হওয়ার চেষ্টা ক'রছেন। আমার কি দুর্মতি হ'ল, মায়ের হাতে কতটা বল এসেছে, বুঝবার জন্য, মা-কে বল্‌লাম,—তুমি আমার হাতখানা জোরে ধর —তোমার হাতে কত জোর এসেছে, বুঝবো। এই কথায় মা হঠাৎ একেবারে নিশ্চল হ'য়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত, মুখ সব কালো হ'য়ে গেল। চোখ-দু'টো কোটর-গত ও আধ-বোজা হ'য়ে রইলো। ঐ আধ-বোজা চোখের দৃষ্টি অসহনীয় ভাবে তীক্ষ্ণ ছিল। মায়ের চেহারায় ঐসব আকস্মিক

পরিবর্তন দেখে, আমি খুবই ভয় পেয়েছিলাম। মা গম্ভীর স্বরে ব'ল্লেন—'পরীক্ষা ক'রো না'। ঐটুকু বলার পরেই, মুহূর্তের মধ্যে, মায়ের চেহারা পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক হ'ল। আমিও চির-হাস্যময়ী মা-কে আবার ফিরে পেলাম। মায়ের ঐ ক্ষণস্থায়ী রুদ্রলীলা দেখার পরে, আর কখনও মা-কে কোনও রকম পরীক্ষা করার চেষ্টা করি নি।

(৪)

মায়ের অনশনের প্রকৃত কারণ

সমাধি-ভঙ্গের পরেও, মা যে কেন অনশন ক'রছিলেন, তা সে-সময়ে মায়ের কাছে যে-সব ভক্ত ছিলেন, বা যাঁরা মা-কে দর্শন ক'রতে আসতেন, তাঁরা কেউই জানতেন না, বা সঠিক অনুমান ক'রতেও পারেন নি। আমিও কিছুই অনুমান ক'রতে পারি নি। তাই, অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে মা-কেই জিজ্ঞাসা করলাম,—মা, তুমি কিছুই খাচ্ছ না কেন? মায়ের উত্তর ছিল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অর্থপূর্ণ ও সহজবোধ্য। মা বলেছিলেন, —সমাধির সূত্র ধরে প্রাণটা কিছুক্ষণের জন্য দেহ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাই সারতে দেরী হ'চ্ছে। আমি বুঝলাম যে, মায়ের গভীর সমাধি গভীরতর হ'য়ে মহাসমাধিতে পরিণত হ'য়েছিল এবং কিছু সময়ের জন্য দেহটার মৃত্যু হ'য়েছিল। ঐ অবস্থা থেকে বেঁচে উঠে, নির্জীব দেহযন্ত্রগুলিকে আবার সজীব ও কার্যক্ষম করা শুধু এই মহাযোগিনীর পক্ষেই সম্ভব।

তবুও অচল ও নিষ্ক্রিয় পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতি দেহ-যন্ত্রাংশ-গুলিকে যোগবলে সচল ও সক্রিয় ক'রে তুলতে সময় লাগছে। ঐগুলি সম্পূর্ণ কার্যক্ষম হওয়ার আগে খাদ্যগ্রহণ হ'ত অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর। ঐ প্রকৃত কারণ উপলব্ধি ক'রতে পেরেছিলাম ব'লে, আমি মা-কে খাদ্য গ্রহণ ক'রতে একবারও অনুনয় করি নি।

(৫)

রোগের মূর্তি ও আমরা

১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে ভোলানাথ যখন তারাপীঠে ছিলেন, সে সময়ে তিনি খবর পান যে, মা রাইপুরে (ডেরাডুন) প্রবল জ্বরে ভুগছেন। ভোলানাথ তারাপীঠ থেকে রাইপুর যাবার পথে, নিউ দিল্লীতে এসে, মায়ের অসুস্থতার সংবাদ আমাদের জানিয়ে যান। নিউ দিল্লীর ভক্তদের অনুরোধে আমি রাইপুরে যাই,—যদি মা আস্‌তে চা'ন, তাঁকে নিউ দিল্লীতে নিয়ে আস্‌বো—এই অভিপ্রায়ে। রাইপুরে পুরানো শিবমন্দির-সংলগ্ন জীর্ণ ধর্মশালার একটা ঘরে মা-কে দেখ্‌লাম শয্যাগত। মায়ের একদিন অন্তর প্রবল জ্বর আস্‌তো। জ্বরটা প্রায়ই সন্ধ্যায় আস্‌তো এবং পরের দিন সকালে ছেড়ে যেত। একদিন জ্বর-ত্যাগের পরে মা ব'ললেন,—কাল সন্ধ্যায় তোমাদের সঙ্গে যখন কথা ব'লছিলাম, তখন রোগের মূর্তিটা ঘরের ঐ কোণে ব'সে কাঁদছিল,—ও চাইছিল এই শরীরে প্রবেশ ক'রতে। আমি তা'কে ব'ললাম,—একটু সবুর কর্। এদের সঙ্গে কথা বলা

শেষ হ'লে, তুই এই শরীরে ঢুকবি। আমি ব'ললাম,—মা, ঐ রোগের মূর্তিটা আমাকে একবার দেখিয়ে দিলে না কেন? ওকে ঝাঁটা মেরে বিদায় ক'রতাম। মা ব'ললেন,—তা' কেন ক'রবে? তোমরা এই শরীরটাকে ভালবাসো, এই শরীরটা নিয়ে খেলা কর। রোগের মূর্তিরাও এই শরীরটাকে ভালবাসে, এই শরীরটা নিয়ে খেলা ক'রতে চায়। ওদের তাড়াবো কেন? দেখে স্তম্ভিত হ'লাম যে, মায়ের সমদৃষ্টিতে রোগের মূর্তি ও আমরা সমপর্যায়ে। তাঁর কাছে ভক্তের ও রোগের মূর্তির সমান কদর।

(৬)

মায়ের চিবানো প্রসাদ

অনেকদিন ধ'রে ইচ্ছা ক'রছিল যে,—মায়ের চিবানো কোনও প্রসাদ যদি পাই তো খেয়ে ধন্য হ'ব। অভাবনীয়-ভাবে সে সুযোগ উপস্থিত হ'ল রাইপুরের জীর্ণ ধর্মশালায় মায়ের অসুস্থতার মধ্যে। ওখানে লক্ষ্য ক'রলাম যে, যেদিন জ্বর আস্‌তো না, সেদিন মা রুটি, তরকারি প্রভৃতি সাধারণ খাদ্য সবই খাচ্ছেন। বিকালের দিকে, মা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—বাবা, আমি জাম্‌বুরা (বাতাবি লেবু) খেতে পারি? আমি বল্‌লাম,—তা পারবেনা কেন? ঘরে বাতাবি লেবু ছিল। মায়ের তৎকালীন সেবিকা—পাহাড়ী ভক্ত রুমাদেবী (*) কিছু বাতাবি লেবু ছাড়িয়ে, নুন ও

* ৬৭ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

গোলমরিচের গুঁড়া মেখে একটা প্লেটে ক'রে মা-কে এনে দিলেন। মা সেগুলি মুখে পুরে', চিবিয়ে প্লেটের একপাশে ছিব্ড়ে রাখছিলেন। মায়ের যখন কিছু পরিমাণ বাতাবি লেবু খাওয়া হয়েছে, তখন আমি ঘরের বাইরে চলে গেলাম। মিনিট্ পাঁচেক বাদে, মায়ের খাওয়া শেষ হয়েছে ভেবে', যেই ঘরে ঢুক্‌লাম, মা অমনিই ছিব্ড়ে-শুদ্ধ প্লেট্‌খানা আমার হাতে দিয়ে ব'ললেন,—বাবা, এই নাও। এদিন আমি চিবানো প্রসাদের কোনও আকাঙ্ক্ষা করি নি। ঐ চিবানো-প্রসাদ-শুদ্ধ প্লেট্ অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে পেয়ে, আমি বাইরে নিয়ে এসে, বাতাবি লেবুর ছিব্ড়েগুলি মস্-মস্ ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌লাম। যদিও আমি স্বচক্ষে দেখেছি—মা ঐ ছিব্ড়েগুলি মুখ থেকে বা'র ক'রছিলেন, তবুও ঐগুলি চিবিয়ে খেয়ে আশ্চর্য হ'লাম যে, ছিব্ড়েগুলি সম্পূর্ণ রসে ভরা ছিল এবং তাতে নুনের ও গোলমরিচের স্বাদও অবিকৃত ছিল।

(৭)

মায়ের পার্বতী মূর্তি

রাইপুরের শিব-মন্দিরের সীমানার বাইরে—মা যেখানে ছিলেন, সেখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে, দিনের বেলায় ব'সে থাক্‌তেন—মায়ের একজন প্রৌঢ় মুসলমান ভক্ত। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের জন্য, তিনি মায়ের কাছে যেতে পেতেন না। কিন্তু, দিনান্তেও একবার মায়ের দর্শনের জন্য

তাঁর আকৃতি ও অধ্যবসায় ছিল অপরিসীম। ঐ সময়ে অসুস্থতার জন্য মা ঘরের বাইরে প্রায়ই আসতেন না। সেদিন, সন্ধ্যার আগে—ঐ অপেক্ষমাণ মুসলমান ভক্তটিকে নিকট থেকে ভাল ক'রে দেখ্‌বার জন্য আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মায়ের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম,—মা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে মুসলমান ভক্তটির দিকে দেখ্‌ছেন। ভক্তটি মা-কে কি-ভাবে দর্শন করলেন তা' ব'লতে পারবো না। আমি কিন্তু চমৎকৃত হয়ে দেখলাম—হিমালয়ের পাদদেশে স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা, শুক্লাম্বরা, পরমাসুন্দরী, দ্বিভুজা দীপ্তিময়ী পার্বতী মূর্তি। তাঁর হিন্দু ও মুসলমান দুই ভক্তকে কিছুক্ষণ ঐ ভাবে দর্শন দিয়ে, মা নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। ঐ দিনেই আমার ঐ দিব্যদর্শন কি কৃপাময়ীর চিবানো-প্রসাদ-সেবনের সদ্য ফলশ্রুতি ?

(৮)

বীরেন-দা'র ব্যর্থ অনশন-চেষ্টা *

ডেরাডুন-কিষেণপুর আশ্রমে যে সময়ে সমাধি-ভঙ্গের পরেও মা অনশনে ছিলেন, তখন বীরেন-দা'ও (†) ঐ আশ্রমে ছিলেন। বীরেন-দা' তো মা-কে দেখতেন নিজের ছোট মেয়ের

---

*এই ঘটনা আমি ছবির-মায়ের মুখে শুনেছি। তিনি ঐ সময়ে মায়ের কাছে ছিলেন, এবং শরীরের ঐরূপ বিকল অবস্থায় অসহায় নিজ-শিশু-জ্ঞানে সর্বপ্রকারে মায়ের সেবা-শুশ্রূষা ক'রে ধন্য হয়েছেন। ঐ সময়ে গুরুপ্রিয়া-দিদি মায়ের কাছে ছিলেন না।

† ৮০ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

মতো। মায়ের ঐ অবস্থায় দেখেছি, মা-কে ধ'রে উঠিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'লে, মা বীরেন-দা'র গায়ে হেলান্ দিয়ে দীর্ঘ সময় ব'সেছিলেন, এবং বীরেন-দা'ও দু'-হাত দিয়ে মায়ের দেহ জড়িয়ে ধ'রে মায়ের পিঠের দিকে ব'সেছিলেন, যা'তে মায়ের অবশ দেহ ঢলে' না পড়ে' যায়। বীরেন-দা' ছাড়া আর কোনও মায়ের পুরুষ ভক্ত কখনও দেখিনি যাঁর গায়ে মা স্বচ্ছন্দে হেলান দিয়ে বসেছেন, বা যিনি মা-কে শিশু-কন্যা-জ্ঞানে, মায়ের দেহের উপরিভাগ অমন নিঃসঙ্কোচ-স্নেহে দু'-হাতে জড়িয়ে ধরতে পেরেছেন। কিন্তু, মায়ের লীলা এত নিগূঢ় যে, বীরেন-দা'র মতো অনন্য ভক্তও তাঁর অনশনের কারণ বুঝ্‌তে পারেন নি। তাই, বীরেন-দা' খাওয়ার জন্য মা-কে অত অনুনয়, অত পেড়াপীড়ি ক'রেছেন। আমি নিউ দিল্লী ফিরে যাওয়ার পরে, মায়ের অনশন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে, নিজে উপবাস ক'রতে আরম্ভ করেন। মা জান্‌তে পেরে তাঁকে অনশন করতে নিষেধ করেন। কিন্তু ঐ তেজস্বী, অভিমানী, অতিমাত্রায়-স্পষ্টবাদী ভক্ত রেগে গিয়ে মা-কে ব'লেছিলেন,— তুমি আমার কে, যে তোমার জন্য আমি উপবাস ক'রতে যাবো? আমি নিজের স্বাস্থ্যের জন্য উপবাস ক'রছি। কিন্তু, মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বীরেন-দা' অনশন ক'রতে পারলেন না। একদিন মাত্র অনশনের পরে, বীরেন-দা'র সারা গায়ে rashes (আমবাত) বেরিয়ে পড়ে। তা'তে বীরেন-দা' অনশন ভঙ্গ ক'রতে বাধ্য হ'ন। নিজে অনশন ক'রে মায়ের উপর চাপ্ সৃষ্টি ক'রে মা-কে অনশন-ভঙ্গ ক'রতে বাধ্য করার তাঁর ঐ

অপচেষ্টা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়। নিশ্চয়ই, এর পরে বীরেন-দা', মায়ের কৃপায়, তাঁর অনশনের প্রকৃত কারণ বুঝতে পেরেছিলেন।

(৯)

"সকলের পথ এক নয়"

১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে দুর্গাপূজার পরে, একদিন সকালে হরিদ্বারে নান্‌কি-বাইয়ের ধর্মশালায় একটা বড় হল্-ঘরে, আমরা স্ত্রী-পুরুষ ৩৫।৪০ জন ভক্ত মা-কে ঘিরে ব'সেছিলাম। একটা প্রশ্ন উঠ্‌লো—সকলের ধর্ম কি এক হ'তে পারে? এই প্রশ্নের মীমাংসায়, মা ব'ললেন,—তা' কেমন ক'রে হবে? একটা গাছের ডালে, একই-বোঁটায়-হয়েছে পাশাপাশি দু'টো পাতা। যদি ভাল ক'রে খুঁটিয়ে তুলনা করা যায়, তা' হ'লে দেখা যাবে যে, শিরা-উপশিরা সব কিছু নিয়ে, দু'টো পাতার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। দু'টো পাতার কোনও না কোনও অংশে অমিল থাক্‌বেই। সেই রকম, দু'টো মানুষ সর্বাংশে একরকম হয় না। তোমরা যে এতগুলি লোক আমার চারিদিকে ব'সে আছ, কোনও দু'জন ঠিক একই জায়গায় নেই। সেই জন্য, আমার কাছে আসবার রাস্তা কোনও দু'জনের ঠিক এক (identical) নয়। অবস্থান-ভেদে, যে কোনও দু'জনের রাস্তায় একটু-না-একটু প্রভেদ থাক্‌বেই। সেই ভাবে, সকলের সাধন-পথ এক নয়,—এক হ'তেই পারে না।

(১০)

"সাধন ক'রতে হবে"

নিউ দিল্লীতে একদিন ভাব-বিহ্বল হ'য়ে, মা-কে বিরলে ব'লেছিলাম,—মা, তোমাকে যখন দর্শন ক'রেছি, আমাদের আর কিছু ক'রবার নেই। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন,—একটা দেয়াশালাইয়ের কাঠি জ্বাললে, হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে তখনই আলো হয়। তা'তে মা ব'লেছিলেন,—তোমাদের ঐ এক কথা। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরের অন্ধকার না-হয় গেল। কিন্তু বদ্ধ ঘরের এঁদো গন্ধ যাবে কেমন ক'রে? অতো সোজা নয়। সাধন ক'রে চিত্ত শুদ্ধ ক'রতে হবে। না হ'লে ভগবদ্দর্শন কি ক'রে হবে?

(১১)

অশোকা অদ্বিতীয়া মা

১৯৩৮ সালের ৬ই মে তারিখে, ডেরাডুন-কিষেণপুর আশ্রমে প্রবল বসন্ত-রোগাক্রান্ত হয়ে, মায়ের উপস্থিতিতে মা-কে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভোলানাথ মহাপ্রয়াণ করেন। ভোলানাথ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাই সন্ন্যাসীদের প্রথানুযায়ী ঐ দিনই হরিদ্বারে গঙ্গায় তাঁর মরদেহের সলিল-সমাধি হয়। ঐ দিনই নিউ দিল্লীতে সাধন ব্রহ্মচারীর কাছে আমি সংবাদ পাই যে, ভোলানাথ আমাকে দেখ্‌তে চেয়েছেন। পরের দিন সকালে কিষেণপুর-আশ্রমে পৌঁছেই আমি জানতে পারি

যে, আগের দিনই তাঁর মহাসমাধি হ'য়েছে। আমি যখন আশ্রমে পৌঁছাই, তখন দেখ্‌লাম,—মা আশ্রমের আউট-হাউসের বারান্দায় ব'সে স্থানীয় কয়েকজন মহিলার সঙ্গে কথা ব'লছেন। প্রায় এক ঘণ্টা বাদে—আশ্রমের সাম্‌নের বারান্দায়—যেখানে আরও কয়েকটি পুরুষ ভক্তের সঙ্গে আমিও ব'সে ছিলাম—মা আমাদের কাছে এসে ব'সলেন। প্রথমেই মা ব'ল্‌লেন,—ওরা (অর্থাৎ স্থানীয় স্ত্রী-ভক্তরা) আমাকে সান্ত্বনা কি দেবে ? ওরাই তো আমার কাছে এসে কান্নাকাটি ক'রছিল। আমিই ওদের বুঝিয়ে শান্ত ক'রলাম। আচ্ছা, আমি শোক করি কি ক'রে বল তো ? আমি স্পষ্ট দেখ্‌ছি—আত্মাটা কোথায় ছিল, কোথায় গেল। মা আমাদের আরও ব'লেছিলেন,—বাবা, তোমরা যে ভাবটা নিয়ে বিয়ে কর, তার কোনও স্পন্দনই এ শরীরে কোনও দিন নেই। প্রাণী-দেহের তুর্জয় স্বাভাবিক বৃত্তির লেশমাত্রও মায়ের দেহে যে নেই—এটা কল্পনাতীত হ'লেও, বাস্তব সত্য। ঐ কারণেই মা সম্পূর্ণ আসক্তি-শূন্যা, মোহ-মুক্তা, অশোকা। ঐ একটা দিক্ দিয়েও মা অভূতপূর্বা, অতুলনীয়া, অদ্বিতীয়া।

(১২)

মুমূর্ষু ভক্তের ইষ্ট-দর্শন ও সদ্‌গতি

ভোলানাথের মহাসমাধি-লাভের পরের দিন (৭।৫।৩৮), কিষেণপুর (ডেরাডুন) আশ্রমে মায়ের একমাত্র পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রলাম যে, তিনি খুব খোলাভাবে ভোলানাথের সম্বন্ধে

আরও অনেক বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কথা ব'লছিলেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অবিরাম-ভাবে। এর মধ্যে একবার বল্‌তে আরম্ভ করলেন—কার কার মৃত্যু-কালে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ভাইজী ও ভোলানাথ ছাড়া তাঁর এক মামার প্রয়াণ-কালে তিনি উপস্থিত ছিলেন, তা'ও ব'ললেন। এই সুযোগে আমি প্রশ্ন ক'রলাম,—মা যতীশ-দা'র ভাই ক্ষিতীশ (*) যখন মারা যায়, তখন নাকি তুমি উপস্থিত হ'য়েছিলে? ঐ সময়ে ঠিক কি ঘটনা হ'য়েছিল, ব'ল্‌বে কি? উত্তরে মা ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'রলেন,—আমি তখন ইণ্টালিতে শচীবাবুর বাড়ীতে ঘটি নিয়ে পায়খানায় যাচ্ছি। সেখান থেকে দেখ্‌ছি, ওর (ক্ষিতীশের) মৃত্যুকাল উপস্থিত। যে শরীরটা পায়খানায় যাচ্ছিল, তা থেকে একটা শরীর বেরিয়ে, ওর শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। আবার ঐ শরীর থেকে—ওর ইষ্ট ছিল ননী-চোরা কৃষ্ণ (মা নীচু হ'য়ে ননী-চোরা কৃষ্ণের ভঙ্গী দেখালেন)—সেই মূর্তি বেরিয়ে ওকে দর্শন দিল। এই পর্যন্ত ব'লেই মা হঠাৎ সংযত হ'লেন এবং বল্‌লেন,—এ কথা আমার মুখ দিয়ে এর আগে কখনও বেরোয় নি।

---

* ক্ষিতীশ গুহ কন্‌ট্রাক্‌টর ছিলেন। বালিগঞ্জে পার্কসাইড রোডে ইনি বাড়ী ক'রেছিলেন। (২৭ পৃষ্ঠায় এই বাড়ীর কিছু বিবরণ আছে)। ১৯৩৬ সালে, ঐ বাড়ীতেই মৃত্যু-শয্যায় মায়ের কৃপায় নিজের ইষ্ট দর্শন ক'রে সদ্‌গতি লাভ করেন। তাঁর শেষনিশ্বাস ত্যাগ করার পরে মা সশরীরে ঐ বাড়ীতে এসে তাঁর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেন। এঁর সমস্ত পরিবার মায়ের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ও মায়ের কৃপা-প্রাপ্ত। এঁর পুত্র শ্রীমান্ নেপাল (S. K. Guha) আমাদের অনেকগুলি আশ্রমের অবৈতনিক হিসাব-পরীক্ষক। এঁর জামাতা দ্বিজেন নাগ একজন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি মা-কে বালিগঞ্জে তাঁর বাড়ীতে এনে, 'গীতা-জয়ন্তী'-উৎসব ক'রেছিলেন।

আজ হঠাৎ বেরিয়ে গেল। আমি শুধু ইসারা ক'রে ওর স্ত্রীকে কিছু জানিয়েছিলাম। তার পরে আমি যখন ক'লকাতায় আসি, তখন সন্ধান ক'রেছিলাম,—ক্ষিতীশের স্ত্রীকে মা ইসারা ক'রে কি জানিয়েছিলেন। আমি জান্‌তে পারলাম যে, ক্ষিতীশ চিরনিদ্রিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে, মা বালিগঞ্জে তাদের বাড়ীতে এসে, ক্ষিতীশের রোদনপরা স্ত্রীকে এই ব'লে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন,—মা, তুমি কেঁদো না, তোমার স্বামীর সদ্‌গতি হ'য়েছে।

(১৩)

মা আনন্দময়ী গরীবেরও মা

মাঝে মাঝে কারও কারও মুখে একটা ক্ষুব্ধ, অনুচ্চ গুঞ্জন শুন্‌তাম যে, মা আনন্দময়ী শুধু বড়লোকদেরই মা। কথাটা যে কত অসত্য এবং ঐরকম উক্তি যে অবস্থাপন্ন লোকদের প্রতি সাধারণ লোকের একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ-প্রসূত, তা' বুঝেছিলাম একদিন ক'লকাতার কালিঘাট চিত্তরঞ্জন বালিকা-বিত্থালয়-ভবনের তিনতলার ছাদের উপরে মায়ের একটা প্রত্যক্ষ আচরণে। সেদিন বিকালে ঐ ছাদে মায়ের কাছে আমরা স্ত্রী-পুরুষ অনেক ভক্ত একত্রিত হয়েছিলাম। তু'জন ছিন্ন ও মলিন-বস্ত্র-পরিহিতা বৃদ্ধা—যাদের দেখে ভিখারিণী মনে হ'য়েছিল—যখন ছাদে উঠে মায়ের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছিল —তখন একজন পুরুষ ভক্ত তাদের বাধা দেন। তারা

উত্তেজিত হয়ে, 'আমরা মায়ের কাছে যাবো' ব'লে বার বার চেঁচাতে লাগ্‌লো। মা শুন্‌তে পেয়ে, তাদের 'ও-মা', 'ও-মা' ব'লে চেঁচিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। তা'রা কাছে এলে, দুই বুড়ীকে নিজের দুই কোলে ব'সিয়ে, 'ও-মা, রাগ ক'রো না' ইত্যাদি ব'লে, তাদের শান্ত ও খুসী ক'রলেন। পরে, দু'জনকেই কিছু প্রসাদ দিয়ে বিদায় দিলেন। তারাও হাসি-মুখে শ্রদ্ধা-ভরে মা'কে প্রণাম ক'রে চ'লে গেল।

(১৪)

মা দারুণ দুর্ভিক্ষ দূর ক'রেছিলেন

১৯৪৩ সালে বিশ্বমহাযুদ্ধের মধ্যে অখণ্ড বাংলায় যে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয়, তার করাল মূর্তি—আমরা ক'লকাতা সহরে থেকেও নিত্যই প্রত্যক্ষ ক'রতাম্। রাস্তার এখানে-ওখানে বুভুক্ষুর কঙ্কালসার মৃতদেহ প'ড়ে থাক্‌তো। সারা দিন ও রাত্রিতে যতক্ষণ বাড়ীতে আলো জ্বল্‌তো, প্রায় প্রত্যেক দরজায় ক্ষুধিত ভিক্ষুকগণের 'মা গো, ফ্যান্ (*) দাও' ব'লে কাতর প্রার্থনা শোনা যেত। ঐ সময়ে, অনন্যোপায় হ'য়ে, শক্তিমতী মায়ের অব্যর্থ হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে, আমি আলমোড়া আশ্রমে গিয়ে মায়ের কাছে নিবেদন করি, —মা, তোমার কাছে আমি তো কিছুই প্রার্থনা করিনি। আজ কিন্তু আমি একটা বিশেষ প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, সারা

* 'ফ্যান্' অথবা 'ফেন্'—ভাতের পরিত্যক্ত জলীয় অংশ।

বাংলায় যে ভয়াবহ ছুর্ভিক্ষ চ'লেছে আর অসংখ্য মানুষের যে নিদারুণ কষ্ট হচ্ছে,—তুমি তার প্রতিকার কর। তখন সন্ধ্যার পরে মিট্‌মিটে আলোয় আমরা অল্পসংখ্যক অন্তরঙ্গ ভক্ত মা-কে ঘিরে ব'সেছিলাম। আমার ঐ প্রার্থনা শুনে সদা-হাস্যময়ী মায়ের মুখে বিষাদেয় ছায়া প'ড়লো। মায়ের অমন বিষণ্ণ চেহারা আমি আর কখনও দেখিনি। যে-সব ভক্ত ও ব্রহ্মচারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মা জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—তোমরা কে কে বাংলায় গিয়ে ছুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের সেবা ক'রবে? তা'তে মুক্তিবাবা, তখন তাঁর বয়স ৬০ বৎসরের উপরে—ব'লেছিলেন,—মা, আমি যেতে প্রস্তুত। আমি যখন রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলাম, তখন অনেক ত্রাণ-কার্য ক'রেছি। সাধন ব্রহ্মচারীও বলেছিলেন,—মা, তোমার অনুমতি পেলে, আমি যেতে প্রস্তুত আছি। আমার প্রাণ দিয়েও যদি আমি একজনেরও প্রাণ বাঁচাতে পারি, তা' হ'লে জীবন সার্থক মনে ক'রবো। এর পরে, মায়ের নির্দেশে, ভক্তদের কাছ-থেকে-পাওয়া ৭।৮ খানা ধুতি একটা পুঁটলিতে বাঁধিয়ে, মা আমার হাতে দিলেন। আর ছু'শো টাকাও আমার হাতে দেওয়ার আদেশ হ'ল। মা ব'লেছিলেন,—ক'লকাতায় যেখানে ছুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের খাওয়ানো হচ্ছে, এ-রকম কোনও জায়গায়, ছুর্গতদের খাওয়ানোর জন্য ঐ টাকাটা দিও—আর কাপড়-গুলোও দিও, তাদের মধ্যে বিতরণের জন্য। ক'লকাতায় ফিরে এসে, ঐ ছু'শো টাকা ও কাপড়গুলো—তখন সাদার্ণ

এভেনিউ-এ, মায়ের বিশিষ্ট ভক্ত রায়বাহাদুর স্থরেন ব্যানার্জির বাড়ীতে অনেকসময়ে বুভুক্ষুদের খিচুড়ী খাওয়ানো হ'চ্ছিল—আমি সেখানে দিই, দুর্গতদের সেবার জন্য। ক'লকাতায় ফিরে এসে আমি দেখে অবাক্ হ'লাম যে —দুর্ভিক্ষের প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে ক'মে গিয়েছে। এর পরে, আর কোনও দিন ক'লকাতায় কোন রাস্তায় দুর্ভিক্ষ-গ্রস্তের মৃতদেহ প'ড়ে থাক্‌তে দেখিনি। ভাতের-ফেন-ভিক্ষুক স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বালিকার করুণ আর্তনাদও আর শুন্‌তে পাইনি। সেবারে, আমাদের ইচ্ছাময়ী মায়ের অমোঘ শুভ-ইচ্ছাতেই ঐ ভয়াবহ দারুণ দুর্ভিক্ষ সামান্য প্রতীক-দানের মাধ্যমে, অভাবনীয়ভাবে দূরীভূত হ'য়েছিল।

(১৫)

মায়ের অবিস্মরণীয় উদার ক্ষমা

১৯৪৫ সালের জুন মাসে, মা ক'লকাতা থেকে পুরী যান। মা-কে বিদায়-প্রণাম জানাতে আরও অনেক ভক্তদের সঙ্গে আমিও হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হই। প্ল্যাটফর্মে মায়ের কাম্‌রার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম্, ছবি ও মণি, আমার দুই মেয়েই, মায়ের সঙ্গে পুরী যাওয়ার জন্য ট্রেণে উঠে বসে আছে। তা'রা যে মায়ের সঙ্গে পুরী যাচ্ছে, তা আমি একেবারেই জানতাম না। মায়ের ইচ্ছায় তারা মায়ের সঙ্গে যাওয়ার স্থযোগ পেয়েছে, এতে আমার তো

খুসী হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু, তার বদলে, আমার হ'ল অভিমান ও ক্রোধ। মায়ের কাছে, এই নিয়ে অনুযোগ ক'রে আমি এলোমেলো কি-সব বলেছিলাম তা' এখন মনে ক'রে সঠিকভাবে ব'লতে পারবো না। তবে, অযথা ঔদ্ধত্য দেখিয়ে, আমি যা-সব বলেছিলাম, তার অর্থ ছিল এই —আমাকে না জানিয়ে আমার মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মায়ের উচিত হয় নি। এখন ভাবি, আমার মেয়েদের সম্বন্ধে মায়ের কি করা উচিত বা অনুচিত তা' বিচার ক'রবার অধিকার সে সময়ে আমাকে দিয়েছিল কে। স্পষ্টই বোঝা যায়, সে সময়ে আমার অহংভাব ও অত্যুগ্র পিতৃত্ব-বোধ আমাকে স্মৃতিভ্রষ্ট ক'রেছিল—আমি মায়ের অপার মহিমা ও আমাদের প্রতি অজস্র কৃপার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। আমার অদ্ভুত খাপ্ছাড়া আচরণের জন্য মা আমাকে একটুও তিরস্কার করেন নি—বোধ হয় অতগুলি ভক্তের সাম্নে আমাকে হেয় ক'রতে চান্নি ব'লে। তিনি স্মিত হাস্যে আমার আচরণ উপেক্ষা ক'রেছিলেন। সকলে একে একে মা-কে প্রণাম করার পরে, ট্রেণ যখন মা-কে নিয়ে চলে গেল, তখন আমার ঐ উদ্ধত আচরণের গ্লানি আমাকে অসহ্য পীড়া দিতে লাগ্লো। সে-দিন খুব ভারাক্রান্ত মন নিয়েই বাড়ী ফিরেছিলাম। কয়েক দিন বাদে, তাদের সমবয়সী একজন ব্রহ্মচারিণীর সঙ্গে আমার মেয়েরা যখন বাড়ী ফিরলো, তখন ব্রহ্মচারিণীটি আমাকে জানালো যে, মা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন,—আমি আমার মেয়েদের

ফিরিয়ে পেয়েছি তো? ঐ ভাবে ক্ষমা পাওয়ায় আমার অনুশোচনার বেদনা তীব্রতর হ'য়েছিল। তার পরে, কতদিন গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠ করার সময়ে, বিশ্বরূপ-দর্শন-ক্লান্ত ও অভিভূত অর্জুনের ভাষায় কেঁদে কেঁদে, মা-কে উদ্দেশ ক'রে আমি এই শ্লোকগুলি মনে-মনে ব'লে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি :

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥
... ...
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥"

[তোমার এইসব মহিমা না জেনে, সখা মনে ক'রে, অনবধানতা বা প্রণয় বশতঃ তোমাকে 'হে কৃষ্ণ', 'হে যাদব', 'হে সখা' এইসব অযথা সম্বোধন ক'রেছি। হে অচ্যুত, রহস্য ক'রে, আহার-বিহারে, শয়নে বা উপবেশনে, একান্তে অথবা লোকের সাম্‌নে, তোমার সঙ্গে যে অসম্মান-সূচক ব্যবহার ক'রেছি, তোমার কাছে সে-সবের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছি।

…হে দেব, পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখীর, প্রিয় (পতি) যেমন প্রিয়ার (পত্নীর) অপরাধ সহ্য করেন, তুমিও সেইভাবে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর।]

শেষ পর্যন্ত এই ভেবে মনে সান্ত্বনা পেয়েছি যে, সেদিন, মায়ের ইচ্ছাতেই মায়ের সাম্‌নে আমার ঔদ্ধত্য অমন ক'রে মাথা-চাড়া দিয়েছিল, মায়ের উদার ক্ষমার মোক্ষম আঘাতে, চিরতরে চূর্ণ হওয়ার জন্যই। মায়ের সব ব্যবস্থাই তো আমাদের কল্যাণের জন্য !

(১৬)

মায়ের দেহরক্ষী মা নিজেই

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। অক্টোবর মাসে বহরমপুরের নাড়ু-ভাই তার নিজ গ্রাম, জলপাইগুড়ি জেলার বোদায়, দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে মা-কে নিয়ে যায়। বোদা গ্রাম পাকিস্তানে। পাকিস্তানে মায়ের যাওয়া নিরাপদ নয় মনে ক'রে, আমি মায়ের দলের সঙ্গে যাওয়ার অভিপ্রায় মা-কে জানালাম। মায়ের অনুমতি পেয়ে, আমিও মায়ের দলের সঙ্গে বোদায় গিয়েছিলাম। সেখানে পূজার তিন দিনই প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে, একটা প্যাণ্ডালে অধিবেশন ব'স্‌তো। অনেক হিন্দু ও মুসলমান গ্রামবাসী সেখানে উপস্থিত হ'য়ে মা-কে নানারকম প্রশ্ন ক'রতেন। অষ্টমী পূজার দিন রাত্রে, অধিবেশনের শেষে,

মা তাঁর কুটীরে ফিরে এসে আমাকে ব'লেছিলেন,—বাবা, আজ তুমি ছিলে না, ভালই হ'ল। তুমি থাক্‌লে একটা গণ্ডগোল হ'ত। মুসলমানেরা কেউ কেউ আমাকে ব্যাঁকা-ব্যাঁকা প্রশ্ন ক'রছিল। ওদের মধ্য থেকেই একজন—তিনি স্কুলের শিক্ষক—তাদের বল্‌লেন,—মা-কে ঐ ধরনের প্রশ্ন আমি ক'রতে দেবো না। সোজাসুজি ধর্মবিষয়ে কারও কোনও সমস্যা থাক্‌লে, মা-কে প্রশ্ন করুন, মা জবাব দেবেন। ঐ ঘটনার বিবরণ শুনে বুঝলাম যে, মায়ের দেহরক্ষী মা নিজেই। আমাদের কারও পক্ষে, 'তাঁর দেহরক্ষা ক'রতে পারি'—ও-রকম চিন্তা সম্পূর্ণ অজ্ঞান-প্রসূত ও অবান্তর।

(১৭)

শেষরাত্রে বিদায়-কালীন দর্শন-দান

১৯৪৭ সালে, ডিসেম্বরের শেষের দিকে, আমি আমার দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে, মায়ের কাছে, আমেদাবাদে যাই। সেখানে মা ছিলেন মুন্‌সাদের বাড়ীর কম্‌পাউণ্ডের ভিতরে সুবৃহৎ, সুরম্য তাঁবুতে। আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম মুন্‌সাদের প্রাসাদোপম বাস-ভবনে। কয়দিন অবস্থানের পরে, মেয়েদের আমেদাবাদে মায়ের কাছে রেখে, আমি দিল্লী হ'য়ে কলকাতায় ফিরি। সময় বাঁচাবার জন্য, আমি আমেদাবাদ থেকে দিল্লী আসি প্লেনে। আমার রওনা হওয়ার সময় ছিল শেষরাত্রে। রাত্রি প্রায় ১০টায়—মায়ের

শরীর তখন বিশেষ অসুস্থ ছিল—দুঃখ ক'রে মা-কে ব'লেছিলাম,—মা, আমি তো শেষরাত্রে রওনা হ'ব। ঐ সময়ে তোমার সঙ্গে তো আর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মা ব'ল্‌লেন,—কেন বাবা? তুমি যাবার আগে আমার তাঁবুর দরজার কাছে এসে 'মা' ব'লে ডেকো—যে আমার কাছে থাক্‌বে, তোমাকে তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়ে নেবে। মায়ের নির্দেশ অনুসারে, শেষরাতে আমি তাঁর তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, অনুচ্চস্বরে একবার মাত্র 'মা' ব'লে ডাক্‌তেই, আমাকে দরজা খুলে তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হ'ল। আমিও ঐ সময়ে অভাবনীয় ভাবে মায়ের দর্শন ও আশীর্দৃষ্টি পেয়ে, নিজকে ধন্য মনে ক'রে যথাসময়ে প্লেনে চ'ড়ে, মায়ের কৃপার কথা স্মরণ ক'রতে ক'রতে দিল্লীতে ফিরলাম।

(১৮)

মায়ের বিশেষ দৃষ্টি ও কৃপা

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে—আমি তখন নিউ দিল্লীতে ছিলাম—একদিন সন্ধ্যায়—ডাক্তার জে. কে. সেনের বাড়ীর সাম্‌নে লন-এ একটা অধিবেশনে মা উপস্থিত ছিলেন। এই-রকম অধিবেশনে সুবিধা পেলেই সাধারণতঃ আমি মায়ের কাছাকাছি বসি। ঐ দিন, অতিরিক্ত ভিড় ছিল ব'লে আমি বেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে মা-কে দর্শন ক'রছিলাম। হঠাৎ —মায়ের কাছেই কাশী কন্যাপীঠের যে-সব মেয়েরা ব'সে ছিল

—তাদের মধ্যে একজন আমার কাছে এসে ব'ল্‌লো,—মা আপনাকে ডাক্‌ছেন। আমি মায়ের কাছে যেতে, মা আমাকে ব'ললেন,—কাল সন্ধ্যায় আমি পাঞ্জাবের দিকে যাবো। আমি গাজিয়াবাদে ট্রেণে উঠবো। ঐ ট্রেণের যে কাম্‌রায় আমার সিট্‌ রিজার্ভ করা থাকবে, সেই কাম্‌রায় দিল্লী থেকে উঠে, তুমি আমার সঙ্গে মীরাট্‌ পর্যন্ত যাবে। বুঝ্‌লাম,—মায়ের আমাকে গোপনে কিছু বলবার আছে, যেজন্য এই ব্যবস্থা। আমি দিল্লী-থেকে-মীরাট্‌ একখানা টিকিট কেটে, ঐ কাম্‌রা খুঁজে নিয়ে ট্রেণে উঠি। মা গাজিয়াবাদে কোথায় যেন মোটরে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে এসে গাজিয়াবাদ ষ্টেশনে যে কাম্‌রায় তাঁর সীট রিজার্ভ করা ছিল—সেই কাম্‌রায় উঠলেন। ট্রেণে যেতে যেতে মা আমাকে বললেন, —তোমার চেহারা খুব খারাপ দেখছি। তুমি শিগ্‌গির কাশীর আশ্রমে চলে যাও। সেখানে থেকে ডাক্তার গোপাল দাশগুপ্তকে দিয়ে চিকিৎসা করাও। মায়ের নির্দেশ মেনে, আমি কাশী-আশ্রমে চলে যাই। সেখানে, পুরানো হল্‌-ঘরের পাশের গোল-ঘরে—যার উপরের গোল-ঘরে মা অনেক-সময়ে দিনের বেলায় ব'স্‌তেন—আমার থাকার জায়গা নির্দিষ্ট হয়। ঘরটা ছিল গঙ্গার উপরে। ঐ ঘর থেকে দিন-রাত আমি গঙ্গা-দর্শন ক'রতে ও গঙ্গার মৃদু কুলু-ধ্বনি শুন্‌তে পেতাম। মায়ের নির্দেশে, ডাক্তার দাশগুপ্তের সুচিকিৎসা ছাড়া, আমার জন্য বিশেষভাবে দুধের ও উপযুক্ত পথ্যেরও ব্যবস্থা হ'য়েছিল। ওখানে নির্জন, পবিত্র, শান্ত, স্বাস্থ্যকর

পরিবেশে, একুশ দিন থেকে, আমি যে আনন্দ পেয়েছিলাম তার তুলনা নেই। ঐ কয়দিনেই, আমার শরীরও বেশ সুস্থ-সবল হ'য়ে উঠেছিল। পরে, মায়ের আদেশে, মে মাসে আম্বালায় মায়ের জন্মোৎসবে আমি যোগদান করি।

(১৯)

বিক্ষুব্ধ ভক্তকে মা বিদায়-দর্শন দিলেন

১৯৫১ সালে মে মাসে, মায়ের বিশেষ নির্দেশে, আম্বালায় মায়ের জন্মোৎসবে আমি উপস্থিত হ'য়েছিলাম। উৎসবের শেষে মা মোটরে অমৃতসরে যান। আম্বালা ত্যাগ করার সময়ে, মা মোটরে বসার পরে, মোটরটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। ঐ সময়ে দীর্ঘাঙ্গী পাঞ্জাবী মহিলারা মোটরটাকে ঘিরে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে একে একে মা-কে প্রণাম জানাচ্ছিলেন। ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও মা-কে একটুও দেখ্‌তে পাইনি। কাছে গিয়ে প্রণাম করার তো কোনও প্রশ্নই ছিল না। আমাকে ঐ অবস্থায় ফেলে, মায়ের মোটর যখন অদৃশ্য হ'য়ে গেল, তখন আমার বুকের ভিতরের রুদ্ধ কান্না আমি কষ্টে সংযত ক'রলাম। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে, আমার আম্বালা ত্যাগ ক'রে, দিল্লী রওনা হওয়ার কথা ছিল। যাওয়ার আগে কিছু খেয়ে নেওয়ার জন্য আমি একটা রেস্তোরাঁতে গেলাম। কিন্তু, খেতে ব'সে আমাকে বার বার পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে চোখ

মুহ্‌তে হ'য়েছিল। চোখের জল কিছুতেই যেন সামলাতে পারছিলাম না। তার পরে, আম্বালায় যে কলেজের হোষ্টেলে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেই হোষ্টেলে, ফিরছিলাম—বিছানা-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে ষ্টেশনের দিকে রওনা হওয়ার জন্য। যাওয়ার পথে দেখলাম—মায়ের মোটরটা হোষ্টেলের দিক থেকেই বেরিয়ে আস্‌ছে। মোটরটা আমার বেশ কাছে এলে, আমি মা-কে মোটরের ভিতরে বেশ ভাল-ভাবেই দর্শন ক'রলাম। যখন হাত-জোড় ক'রে, মাথা নীচু ক'রে মা-কে প্রণাম ক'রলাম, তখন মায়ের দৃষ্টি আমার দিকে। মা-ও হাত-দু'টি জোড় ক'রে, একদিকে মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিতে আমার প্রণাম গ্রহণ ক'রলেন। সে-দিন উৎসব-স্থল থেকে বেরিয়ে,—আম্বালাতেই এখানে-ওখানে এক-ঘণ্টার উপর মোটরে ঘুরে, আমাকে বিদায়-দর্শন দিয়ে, আমার বিক্ষুব্ধ, ক্রন্দন-রত মনকে শান্ত ক'রে, তবে মা আম্বালা ত্যাগ ক'রতে পারলেন—এতোই মায়ের কৃপা আমার উপর।

(২০)

রোগক্লিষ্ট ভক্তকে মায়ের দর্শন-দান

১৯৭২-৭৩ সালে, প্রায় এক বৎসর আমি chronic bronchitis (শ্বাসনালীর প্রদাহ-সহ পুরানো কাসি) ও হাঁপানিতে ভুগেছি। প্রায় দশমাস যাবৎ আমি বিছানায়

শুয়ে ঘুমুতে পারি নি। ব'সে-ব'সেই যতটা সম্ভব ঘুমিয়েছি। মা-কে অসুস্থতার খবর জানানো হ'লে, মা ভালো ডাক্তারকে দেখানোর নির্দেশ দেন। ভালো ডাক্তারকে দেখানোর উদ্দেশে আমি ২-রা মার্চ (১৯৭৩) ক'লকাতায় গিয়ে, আমাদের ভবানীপুরের বাসায় থাকি। বড় (দর্শনী ৬৪ টাকা) ও মেজো (দর্শনী ১৬ টাকা) দুই ডাক্তারের চিকিৎসা-সত্ত্বেও আমার রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঐ অবস্থায় আমি মায়ের দর্শন পাওয়ার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হই। ভাগ্যক্রমে, মা ক'লকাতায় এসে ১১ই মার্চ তারিখে সকালে, আমাদের বাসার গলির মুখে মোটর থামিয়ে, আমাকে তাঁর কাছে ডাকেন। একজন বলিষ্ঠ যুবকের সাহায্যে নীচে নেমে, গলিটা পার হয়ে গিয়ে, মোটরের ভিতর মা-কে দর্শন ক'রলাম। স্বাভাবিক-ভাবে মিষ্টি হেসে মা প্রশ্ন ক'রলেন,—বাবা, কেমন আছ? আমিও হেসেই উত্তর করলাম,—ভালো আছি। আমিও প্রশ্ন ক'রলাম,—তুমি কেমন আছ? মা উত্তর ক'রলেন,—এই যেমন দেখছ। তারপরে, মায়ের কোলে মাথা রেখে, প্রাণ ভ'রে প্রণাম ক'রলাম। মা-ও বার বার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রলেন। তারপরে মা চলে গেলেন বৃদ্ধ রায়বাহাদুর দেবেন চাটুয্যেকে * দর্শন দিতে। শুন্‌লাম—আমাকে দর্শন দেওয়ার আগেই মা অপর্ণা দেবী (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়ের মা)-কে দর্শন দিয়ে

---

* ১০ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

এসেছেন। ঐ দিন থেকেই, মায়ের আশীর্বাদে ডাক্তারদের চিকিৎসা আমার উপরে ফলপ্রসূ হ'তে লাগলো। আড়াই-মাস কাল চিকিৎসিত হ'য়ে, অনেকটা সুস্থ হ'য়ে আমি কল্যাণীতে মায়ের চরণ-স্পর্শ-পূত এই বাড়ীতে ফিরে এসেছি। এখন এই পুস্তিকা-প্রণয়নের কাজ হাতে নিয়েছি।

অষ্টম অধ্যায়

মায়ের বাণী ও প্রশ্ন-সমাধান

মায়ের অনেক উপদেশ ছাপানো হয়েছে। ভাইজী-প্রণীত 'সদ্‌বাণী'তে (যার ইংরাজী, হিন্দী ও গুজরাতী ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে) ১০১-সংখ্যক বিভিন্ন উপদেশ সংগৃহীত হয়েছে। ভাইজীর 'মাতৃদর্শনে'ও (তারও হিন্দী ও ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে) ১২টি উপদেশ সঙ্কলিত হয়েছে। এ ছাড়া, গুরুপ্রিয়া দিদির "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী"-পুস্তকে (যার ১৭ খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে), ৺অমূল্য দত্ত-গুপ্তের "শ্রীশ্রীআনন্দময়ী প্রসঙ্গ"-পুস্তকে (যার ষষ্ঠ খণ্ড বর্তমানে 'আনন্দবার্তা'য় প্রকাশিত হচ্ছে), গঙ্গাসমীরণ ও বিভুপদ কীর্তির "আনন্দময়ী মা"-পুস্তকে এবং আরও কোনও কোনও বাংলা ও ইংরাজী পুস্তকে (কখনও বা প্রশ্নের উত্তর হিসাবে) এবং 'আনন্দবার্তা'র অনেক সংখ্যায় মায়ের বহু অমূল্য উপদেশ হৃদয়গ্রাহী ভাবে প্রচারিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের "অমরবাণী"-পুস্তকেও মায়ের বেশ কয়েকটি দুর্বোধ্য উপদেশ প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু, ঐসব উপদেশ-রাশি ও ব্যাখ্যা থেকে, মায়ের সহজ, সরল, সুসাধ্য, সংক্ষিপ্ত বাণী যে কি, তা' বুঝে উঠা মুস্কিল। এই অধ্যায়ে, তাঁর সাক্ষাৎ উপদেশ থেকে তাঁরই কৃপায়, যে দুটি মাত্র অমিয়-বাণী আমি সংগ্রহ ক'রেছি, সেই দুটি বাণী, এই

অধ্যায়ের সূচনাতেই, সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থাপিত ও কিছু বিশদভাবে আলোচনা ক'রবো।

প্রথম বাণী ঃ সকলের সেবা ক'রে ভগবান লাভ করা যায়। কিন্তু এই সেবা ক'রতে হবে 'তদ্‌বোধে' অর্থাৎ ঈশ্বর-জ্ঞানে। পুত্রকে বালগোপাল-ভাবে, স্বামীকে পরমপতি-বোধে, স্ত্রী ও কন্যাকে সাক্ষাৎ গৌরী মনে ক'রে সেবা ক'রতে হবে। এই সংসারটা ভগবানের—আমি সেবক মাত্র। তাঁর নির্দেশ-মতো আমি শুধু সেবা ক'রে যাবো। এই ভাবটা সব সময়ে, সর্বক্ষেত্রে মনে রেখে চলতে হবে। তদ্‌বুদ্ধিতে সেবার ভাব নিয়ে সব কাজ ক'রলে, তাঁকেই পাওয়া যায়। ঠিক এই ধরনের কথা দেখি, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ঃ

"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্ যেন সর্বমিদং ততঃ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥"

[অর্থাৎ, যা' থেকে প্রাণী-সকল সৃষ্ট হ'য়েছে, যিনি বিশ্বব্যাপী, নিজ কর্ম দ্বারা তাঁকে সম্যক্ অর্চনা ক'রে, মানব সিদ্ধিলাভ করে।]

শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে অনুরূপ কথা বলেছেন কপিলরূপী ভগবান্ মাতা দেবহূতিকে তত্ত্বজ্ঞান-দান-প্রসঙ্গে ঃ

"অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্ ॥"

[অর্থাৎ সর্বান্তর্যামী সকল প্রাণীতে অবস্থিত আমাকে অবজ্ঞা ক'রে অজ্ঞ মানব যে প্রতিমা পূজা করে, তা' বিড়ম্বনা-মাত্র।]

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে দেখি, ভক্ত উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ শেষ উপদেশ দিয়েছেন,—মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা সর্বভূতে মদ্‌ভাব অনুভব করাই আমাকে লাভ করার সকল উপায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।

চৈতন্যদেবও বলেছেন,—ভক্তিমার্গে 'জীবে দয়া' ছাড়া সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে দয়া করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

এই তদ্‌বোধে সেবা সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য, এবং অভ্যাস দ্বারা সুসাধ্য হয়। সকলের মধ্যেই তিনি—'হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্'। সুতরাং কারও প্রতি দুর্ব্যবহার করা যাবে না। তদ্‌বোধে সেবা যে পিতা বা মাতা ক'রবেন, তিনি ক্রোধ-বশে পুত্র বা কন্যার গায়ে হাত তুল্‌তে পারবেন না। এইভাবে বিভাবিত শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাঁর ছাত্র বা ছাত্রীকে প্রহার ক'রতে পারবেন না।

'যত্র জীব তত্র শিব যত্র নারী তত্র গৌরী'—ঐ কথা মা শুধু যে মুখে শিক্ষা দেন, তা' নয়। ঐ কথার প্রভাব তাঁর যাবতীয় আচরণে পরিস্ফুট। মা বলেন,—আমি তোদের যত ভালবাসি, তার এক কণাও তোরা আমাকে ভালবাসিস্ না। এটা তাঁর পক্ষে সত্য ও সহজ হয়েছে এইজন্য যে, মা দেখেন—প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান্—তিনি নিজেই—সুতরাং প্রত্যেককে তিনি পূর্ণভাবে ভালবাসেন। তাই, তাঁর ভালবাসা অপরিমেয়।

এই তদ্‌বোধ-ভাবটা যে কত কার্যকর, তা' একটু ভেবে দেখলেই বুঝা যায়। কেউ আমার নিন্দা ক'রেছেন কিম্বা আমাকে গালি দিয়েছেন। আমি যদি ঠিক মনে-প্রাণে বুঝি যে—তিনিই নিন্দা ক'রেছেন বা গালি দিয়েছেন, তা' হ'লে আমার ক্রোধ হবে না। বরং আমি ভাববো—কেন নিন্দা ক'রেছেন বা গালি দিয়েছেন। আমার কি কোনও ত্রুটি হ'য়েছে? এই ভেবে নিজে শান্ত হ'তে পারবো এবং দোষমুক্ত-ও হবো। এই ভাবটা নিয়ে চলতে পারলে ভেদ-বুদ্ধি ক'ম্‌বে—সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাত্র্য বাড়বে। সমাজ একতাবদ্ধ, শক্তিশালী ও পরস্পরের সহায়তায় উন্নতিশীল হ'তে পারবে। ঐ প্রথম বাণীর মধ্যে আছে—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই ত্রিমার্গের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারিক প্রয়োগ-বিধি।

দ্বিতীয় বাণী ঃ নাম-জপ দ্বারা ভগবান লাভ করা যায়।

এই বাণীও নূতন নয়। গীতায় আছে—'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'। অর্থাৎ, যত-রকম যজ্ঞ আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে 'জপ-যজ্ঞ'। জপের অর্থ,—মনে-মনে বার বার ভগবানের নাম উচ্চারণ। এই জপ চ'লবে গোপনে। ঠোঁট নড়বে না। এমন কি, কণ্ঠেও কোনও স্পন্দন বুঝা যাবে না—এই রকমই আমাদের মায়ের নির্দেশ। এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে—কি নাম, কোন্ নাম জপ ক'রতে হবে? গুরু যে নাম বা মন্ত্র দেন, তা'ই জপ ক'রতে হবে—এটাই সনাতন চির-আচরিত বিধি। তা' হলে, কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, গুরুর খোঁজ করতে হবে এবং গুরু না-পাওয়া পর্যন্ত

জপ আরম্ভ করা যাবে না। এই ব্যাপারে আমাদের মা যে সহজ, সার্বজনীন ব্যবস্থা দিয়েছেন তা' অপূর্ব, অনন্য—আর কোথাও শুনিনি, বা কোনও পুস্তকেও প'ড়িনি। মা বলেন,—যে নাম তোমার ভাল লাগে, সেই নামই তুমি মনে-মনে, বার বার—নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, উঠতে-ব'স্‌তে-শু'তে-চ'লতে, যথাসম্ভব সবসময়ে, জপ কর। এই নাম অনেকরকম হ'তে পারে। মা বলেন,—'সব নাম তাঁর নাম, সব রূপ তাঁর রূপ'। এই নামগুলি মায়ের কাছে শুনেছিঃ হরি, হরিবোল, কৃষ্ণ, গোপাল, গোবিন্দ, রাম, শিব, দুর্গা, কালী, তারা, মা, নারায়ণ, 'নমো নারায়ণ', ভগবান, রাধে-কৃষ্ণ, রাধে-শ্যাম, সীতারাম, 'রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে', 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' এবং 'জয় শিব শঙ্কর/বম্ বম্ হর হর'। আবার মায়ের ভক্তরা অনেকে এই মন্ত্রগুলি জপ করেন ঃ 'ওঁ নমো নারায়ণায়', 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়', এবং 'ওঁ মা'। মা বলেন,—সব নামেই শক্তি আছে। তুমি যে নামই নাও না কেন, সেই নাম নিয়েই তুমি গন্তব্য-স্থানে পৌঁছুতে পারবে। এই বিষয়টি মা একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেন। মা ব'লেছিলেন,—ছোট শিশু 'মা' ব'লতে শেখেনি। সে যখন 'ওয়া', 'ওয়া' আওয়াজ ক'রে তার মা'কে ডাকে, তার গর্ভধারিণী মা তো বুঝতে পারে যে, শিশু তা'কেই ডাক্‌ছে। পরে, ঐ শিশুর মুখে যখন কথা ফোটে, তখন তার মা-ই শিখিয়ে দেয়,—আমাকে 'মা' ব'লে ডাক্। তাই, যে নাম নিয়ে জপ আরম্ভ

করা হয়, বিশ্ব-জননী, বিশ্ব-পিতা বা বিশ্ব-পতি তো বুঝতে পারেন যে, তাঁকেই ডাকা হ'চ্ছে। তিনি সময়-মতো এসে, যদি নাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, সাক্ষাৎ গুরুরূপে, অথবা স্বপ্নে বা সাধকের মনে, উপযুক্ত নাম বা মন্ত্র দেবেন। সে গুরু-দায়িত্ব তাঁর, যাঁর হাতে সুদীর্ঘকালব্যাপী জপের মাধ্যমে সাধক নিজেকে সমর্পণ ক'রেছে এবং যিনি সাধক জন্মাবার পূর্বেই তার মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ যুগিয়েছেন।

প্রথম প্রশ্ন : জপে মন লাগছে না। অন্য কিছু চিন্তা ক'রতে ক'রতে জপ করলে, কোনও সুফল পাওয়া যায় কি?

উত্তর : মা ব'লেছেন, "মন না লাগলেও, নামেরই একটা নিজস্ব প্রভাব আছে। না জেনে, অন্যমনস্ক-ভাবে যদি আগুন ছোঁয়া যায়, আগুন তো তার কাজ ক'রবে-ই।" রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন,—"ভগবানের নাম 'জান্তে-অজান্তে-ভ্রান্তে' (ভুল ক'রে) উচ্চারণ ক'রলেও, তার সুফল কিছু হবেই।" মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব'লেছেন,—"নামে অরুচি হইলে, তাহার ঔষধও নাম।" গুরু নানক ব'লেছেন,—" 'সর্ব রোগকা' ঔষধ নাম" (অর্থাৎ, নাম-জপ দ্বারা সব রোগ সারানো যায়)।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : সেবা অথবা নাম-জপ, কোন্‌টি বেশী ফলপ্রদ?

উত্তর (*) : কারও কারও ব'সে নাম-জপ ক'রতে ইচ্ছা হয় না। তাদের পক্ষে সেবা ক'রে চিত্ত-শুদ্ধি করা ভাল।

* গুরুপ্রিয়া দেবীর "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী", পঞ্চদশ ভাগ, ২৪৬ পৃষ্ঠা।

আবার একটা কথা আছে,—নাম-জপ ক'রে চিত্ত-শুদ্ধি না হ'লে, সেবা-ও ঠিক্-ঠিক্ হয় না। তদ্‌বোধে-সেবা ও নাম-জপ দু'টোই দরকার। একটা অপরটার পরিপূরক। দু'টোতে মিলেই সামগ্রিক সাধন।

তৃতীয় প্রশ্ন : মা কি সন্তানের উপর কখনও রুষ্টা হন ?

উত্তর (*) : মা রুষ্টা হন না বটে। কিন্তু সন্তানের মঙ্গলের জন্য অনেকসময় রুষ্টার মতো ব্যবহার করেন। তার দ্বারা সন্তানের ইষ্টই হয়। অনিষ্ট হয় না।

চতুর্থ প্রশ্ন : ভক্ত ও সাধক ব্যক্তিরা অনেকেই খুব কষ্ট পান। তাঁদের দুঃখ-ভোগের কারণ কি ? ফলই বা কি ?

উত্তর (†) : অনেক সময়ে ভগবান্ ছোট দুঃখ দিয়ে বড় দুঃখ হরণ করেন। দুঃখ-ও তাঁরই এক রূপ। দুঃখের ভিতর দিয়েও তিনি অনেকসময় জীবকে নিজের কাছে টানেন। দুঃখ-ও একটা সুযোগ। দুঃখ-ভোগের মধ্যে সবসময় কর্মক্ষয় (প্রারব্ধ কর্মের ফল-ভোগ) হয়। বিপদ মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে, সে কতো দুর্বল, কতো অসহায়। সে যখন দেখতে পায় যে—নিজের চেষ্টায় কিছুই হয় না, তখন একটা সুযোগ আসে তাঁকে ডাক্‌বার। বিপদে পড়লে আপনা হ'তেই সে-ডাক্ এসে যায়। তিঁনি বিপদ-বারণ কি-না! দুঃখ-ভোগকে যারা তাঁকে ডাক্‌বার সুযোগে পরিণত ক'রতে পারে, তাদের পক্ষে দুঃখ পরম বন্ধু।

---

* গুরুপ্রিয়া দেবীর "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী", পঞ্চদশ ভাগ, ৩১ পৃষ্ঠা।

† গঙ্গাসমীরণের "আনন্দময়ী মা", ১১৪-১১৫ পৃষ্ঠা।

বাংলা পুস্তকাবলী

১। মাতৃদর্শন—"ভাইজী" ৫·০০ টাকা

২। সৎবাণী—"ভাইজী" ২·০০ টাকা

৩। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী—শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী
(প্রথম—সপ্তদশ ভাগ) ৪৮·৫০ টাকা

৪। অখণ্ড মহাযজ্ঞ ২·৫০ টাকা

৫। কীর্তন রস-স্বরূপ ১০·০০ টাকা

৬। অমর বাণী ১০·০০ টাকা
(মায়ের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এবং মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ কর্তৃক ব্যাখ্যাত)

৭। শ্রীশ্রীরামগীতা ২·০০ টাকা
(স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ কর্তৃক সঙ্কলিত)

SHREE SHREE ANANDAMAYEE CHARITABLE SOCIETY
VARANASI